অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা

সম্পাদনা সুনীল দত্ত

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০০৯

উপহার

সুকবি ও সুসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় সুচরিতেষু

মহাশয়,

আপনি সরল ও উদার বলিয়া নহে—একদিন স্বীয় সৌজন্যে মুগ্ধ করিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে কিছুদিনের জন্য আপনার "সুরেন্দ্র-কুটীরে" বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন,—অতীতের সেই পুণ্য-স্মৃতিটুকুকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" আপনার কর-কমলে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সমর্পণ করিলাম।—ইতি—

১৩, বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩০ সাল

গুণমুগ্ধ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নিবেদন

"মজলিস"-সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ, মহাশয়ের উৎসাহে এবং উদ্যমশীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সুহৃদ্বরের আগ্রহে 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' প্রথমে "মজলিস" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহা আবশ্যকমত সামান্য সংশোধিত এবং দুই চারিটী রঙ্গ-কথা নূতন সংযোজিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মুস্তফী প্রভৃতি বঙ্গনাট্যশালার প্রবীণ ও প্রৌঢ় অভিনেতাগণ 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' সংগ্রহে আমাকে অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন এ নিমিত্ত তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। 'বাসনা', 'কনক ও নলিনী' এবং 'আমার কথা', রচয়িত্রী সুবিখ্যাতা প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষতঃ শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী কেবলমাত্র রঙ্গ-কথা নহে, 'ব্লক' করিবার জন্য তাঁহার নিকট বহুকাল হইতে সযত্নে সংরক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ফটোপ্রদানে আমাকেযথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

মাননীয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাটী লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানিকে গৌরবান্বিত এবং তৎসঙ্গে আমাকেও ধন্য করিয়াছেন।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ যদ্যপি 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' পাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত পরিশ্রম স্বার্থক জ্ঞান করিব।

১৩নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৩০ সাল

বিনীত—
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

(নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু কর্তৃক লিখিত)

একদিন ফিল্‌ডিক্‌, জনসন, অ্যাডিসন, স্মলেট, রিচার্ডসন, গ্যারিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ wit নামে অভিহিত হইতেন ; এ-দেশেও রসজ্ঞ এবং পণ্ডিত এক কথাই ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রসরাজও ছিলেন, গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন ; কিন্তু ভাঁড়ে থাকিতে থাকিতে খেজুর রস, তালের রসও যেমন তাড়ি হইয়া পড়ে, কথার রসেরও সেই দশা দাঁড়াইল। এখন কেহ রসিকতা করিলে গম্ভীর লোকে তাহা ছ্যাব্‌লামো বা ভাঁড়ামি বলিয়া নিন্দা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত যাঁহারা আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা জানেন,—কত রসের কথা—হাসির কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত, কিন্তু তাঁহাকে কেহ রসিক বলিতে সাহস করেন না। বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু রসের সাগর, কিন্তু লোকে মনে করেন ইহাদিগকে রসিক বলিলে ছোট করা হইবে ; দীনবন্ধুবাবুকে কেহ কেহ রসিক বলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলও বলিয়া ফেলেন।

এই অশ্লীল কথাটির রহস্যভেদ করা বড় দুরূহ। কতকগুলা কথা আছে বটে যাহাতে রস মোটে নাই কেবল ঘৃণা-উদ্দীপক বীভৎসতা মাত্র,—সেগুলি তাড়িখানাতেই উচ্চারিত হইয়া থাকে, একেবারে ভদ্রতা না হারাইলে কেহ তাহা আর মুখে আনেন না। আর কতকগুলি কথা আটপৌরে হইয়াই এবং প্রয়োগদোষেও এক্ষণে লোকের কানে খট্‌ করিয়া লাগে। ধরুন, নিতম্ব কথাটি—যখন ভারতচন্দ্র ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন সাধারণ লোকে উহার অর্থ জানিত না, যেমন এখন কাঞ্চীপদের অর্থ অনেকে জানেন না ; টোল ছাড়িয়া নিতম্ব যেমন গোয়ালে ঢুকিল—অমনি অশ্লীল হইল। পয়োধর শব্দ মাতৃ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য, যে আধার হইতে পয়ঃ পান করিয়া ক্রোড়স্থ

শিশু তুষ্টি ও পুষ্টিলাভ করে তাহাকেই পয়োধর বলা যায়, কিন্তু প্রয়োগদোষে ঐ মধুর পবিত্র শব্দটি অবাচ্য ও অশ্রাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকান্ত ডাকিলেন,—'হরে'—হরি তখন সুখান্বেষণে অন্যত্র গমন করিয়াছে ;" এখন তরুণ যুবকেরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-প্রসঙ্গে বন্ধু বিশেষের উদ্দেশ্যে যদি বলিতে আরম্ভ করেন, "অমুক এখন সুখান্বেষণে অন্যত্র গিয়াছে।" তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই "সুখান্বেষণ" শব্দটিকে নর্দ্দমাজাৎ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থগত বিদ্যার বাহুল্যও বোধহয় উপস্থিত বক্তার সংখ্যা কমাইয়া দিতেছে , 'কোটেসন' এখন অনেক পরিমাণে উপস্থিত বচনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

সামাজিক বৈঠকে বসিনা জনসন, গ্যারিক, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি মনীষীগণ কত রসের কথা কহিয়া গিয়াছেন, সাময়িক বন্ধুরা তাহার অনেকই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা কতই না আনন্দ উপভোগ করি, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতি কত মজার কথা,—মজা অথচ জ্ঞানানন্দপ্রদ—কিন্তু সে সব কথা একেবারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে। ইংরাজিতে নাট্যশালায় রসালাপ সম্বন্ধে Green-room Gassip ধরনের অনেক পুস্তকেই কত নট-নটীর সামাজিক জীবনের প্রতিভা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় ; আমাদের—এই কাঙ্গাল অভিনেতাদের কতক কতক কথাও হয়তো বাসি হইলে খাটিয়া যাইবে ; বোধহয় এই মনে করিয়াই শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতেছেন। খেলিতে বসিলে রং-বেরং দুই রকমেরই তাস হাতে রাখিতে হয়, অবিনাশচন্দ্রের সংগ্রহের মধ্যে যদি কাহারো কোন কথা বেরং বলিয়া বোধহয়, তাহা হইলে তিনি তাহা অনায়াসে পাশে চালাইয়া দিতে পারিবেন ; সেও একটা লাভ। আর রং-এর কথা পড়িলে অনেক আসরে তুরুপ মারিয়া পাঞ্জার পাড়ংও পাতিতে পারিবেন।

বড় কষ্টের জীবন দাঁড়াইয়াছে আমাদের ; আমরা শুকাইয়া যাইতেছি।

স্কুল-কলেজের পড়ায় রস প্রায় নাই, কর্মজীবনে শুষ্ক খাটুনি, যাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জন করেন, তাঁহারাও যে টাকার কোন রস পান, তাঁহাদের মুখে ও ব্যবহারে তাহা বোধ হয় না। পারিবারিক মিলন বা বৈঠকে বন্ধু সমাগম তো নাই-ই। চায়ের বাটি আর চুরুটে কত রস আছে জানি না, কিন্তু এই "রঙ্গ-কথায়" বোধ হয় যেন একটু রস আছে—বেশ ঝাল ঝাল—টক্ টক – মিষ্টি মিষ্টি !

সেকালের নাট্যচর্চ্চার আড়ালে

সু. দত্ত

আমরা আমাদের অতীতকে মাঝে মাঝেই জানতে চেষ্টা করি, কারণ ঠিক জানি না। তবে এইটুকু বুঝি, না জানলে মনে হয় বড়ই নিঃসঙ্গ, বড় একা, অতীত থেকে যে কিছু পাওয়ার আছে, যে পাওয়াটা একটা বেগবান প্রেরণার কাজ করে, যে প্রেরণাটা একটা স্তর থেকে আর একটি স্তরে এগিয়ে নিয়ে যায়। বোধহয় সেই জন্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় আমাদের মহান অতীতকে!

আমিও তেমন কিছু খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম, একটি অমূল্য সম্পদ। দেখলাম বহুকাল আগের পুঁথির মতন খাতা পড়ে আছে একটি দুষ্পাপ্য দলিল, যদিও হাসিতে ভরা কাহিনী, কি আশ্চর্য্য! সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে অজস্র বিন্দু বিন্দু চোখের জল। সেই হাসিতে ভরা টুকুরো টুকরো কাহিনীকে ঘাঁটতে গিয়ে আরো জড়িয়ে পড়লাম, দেখলাম সেকালের অসংখ্য মজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে। তার-ই দু-একটা টুকরো কাহিনী এখানে উপস্থিত করছি। "নাচ ঘর" ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

"সে সময়ে নাকি অনেক অভিনেতাই মদ না খেলে অভিনয় করতে পারতেন না। মদ খাওয়াটাকে তাঁরা কোন দোষের মধ্যে ধরতেন না। এবং যবনিকার অন্তরালে গাঁজার চিতা জ্বললেও ম্যানেজার অথবা সত্বাধিকারী কিছু বলতে পারতেন না। মদ তুরীয়ানন্দের প্রভাবে অনেক সময়ে অভিনেতারা রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে যা-তা বলে ফেলতেন।

একজন অভিনেতা ইনি এ যুগে ভাল অভিনেতা বলে নাম করেছেন। একবার সত্যিকারের এক ভাল অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করছিলেন। রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার পরে আনন্দের আতিশয্যেই হোক, অথবা অন্য কোন

সাপ্তাহিক সজলিকো। ১১ই কার্ত্তিক ১৩২৯ এই সময়ে হইবে সচিত্র শিশির, সাপ্তাহিক শিশির, বাসন্তি, রূপ ও রঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের আদিযুগের ইতিহাস ঐ সমস্ত ধারাবাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। রূপ ও রঙের বিনোদিনীর যে সংশোধিত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, তার সংশোধনও ইনিই করেন। গিরিশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার পর থেকে গিরিশচন্দ্রের নিত্য সঙ্গী হন ও বসুপাড়ার গিরিশ ভবনে বাকী জীবন যাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ) অভিভাবক-স্বরূপ ঐ বাড়ীতেই থাকতেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সব শেষ এই কথাই বলি সেকালের শিল্পী জীবনের কতো বিচিত্র কাহিনী লুকিয়ে আছে এই রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথায়। একালের নাট্যচর্চ্চায় যদি এই গ্রন্থ কোন কাজে আসে তাহলে আমার কাজ সার্থক মনে করব। এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেরই অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের মধ্যে শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্যতম।

সব থেকে বড় কথা এই ধরণের পুরনো স্মৃতিকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, সেখানেও ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্রাবোর্ণ রোড শাখা, টাকা ঋণ দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে তাঁরা জাতীর গৌরবকে উজ্জল করে তুলেছেন এ একটা নতুন দৃষ্টান্ত বলা যায়।

পরিশেষে এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশকের নিবেদন

দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার পর নাট্যশালার শতবর্ষে এ ধরণের বইয়ের প্রয়োজনে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা নতুনভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। পাঠক সাধারণের এ-বই নিঃসন্দেহে আনন্দের সঙ্গী হবে, এ-বিশ্বাস আমার আছে। এ-ধরনের বইয়ের সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত পেলে ভবিষ্যতে এরকম বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হবো।

গুরুর গুরু।

একদিন জনৈক যুবক নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"নাট্যকলা সম্বন্ধে মহাশয়ের নিকট কিছু উপদেশ শুনিতে আসিয়াছি।" গিরিশবাবু সেদিন বিশেষ কোন-কাজে ব্যস্ত না থাকায় যুবকের সহিত নাট্যকলা সম্বন্ধে নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। যুবকটীও ক্রমে ক্রমে বেশ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া শেষে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার বাচালতা দর্শনে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বাপু, তুমি আসিয়া প্রথমে বলিলে, কিছু উপদেশ শুনিতে আসিয়াছ ; তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে তুমি আমাকেই উপদেশ দিতে আসিয়াছ।"

আমি যে রাঠোর।

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নামক ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ে চিতোর ও রাঠোরপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য মহাসমারোহে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইত। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহা-দিগকে শিক্ষা দিতেন, এবং রঙ্গমঞ্চে পাছে বিশৃঙ্খলা ঘটে, এজন্য তিনি রাঠোরপক্ষীয় সৈন্যগণের নাম 'রাঠোর' এবং চিতোরপক্ষীয় সৈন্য গণের নাম 'চিতোর' রাখিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি 'চিতোর' বলিয়া

ডাকিতেন, সেই সময়ে চিতোরপক্ষীয় সৈন্যগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিত,—এইরূপ 'রাঠোর' বলিয়া ডাকিলে রাঠোর সৈন্যগণ আসিত। তাহারা কেবল কে কোন পক্ষীয়—এইটুকু মনে রাখিত।

একদিন উপেনবাবুর বাটীতে জনৈক গুড়ওয়ালা গুড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। গুড়-বিক্রেতা বলিতেছে,—"পাঁচ আনা সের।" উপেনবাবু বলিতেছেন,—"ঠিক দর বল্, চারি আনার বেশী দেব না।" গুড়-বিক্রেতা করযোড়ে বলিল,—"আজ্ঞে আমি ঠিক দর ব'লেছি, আপনি গুরু, আপনার কাছে কি মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারি।" উপেন-বাবু কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বেটা ছোটলোক, যা মুখে আসে তাই বলিস্, আমি তোর গুরু?" গুড়-বিক্রেতা বিনয় ও ভক্তিসহকারে নিবেদন করিল,—"সে কি বাবু, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না, আমি যে 'রাঠোর!"

বগলে অংশুমালী।

বেঙ্গল থিয়েটারে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়-বিরচিত 'অনলে বিজলী' নামক নূতন নাটকের অভিনয় ঘোষিত হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য রসরাজ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত পথে তাঁহার পরিচিত উক্ত থিয়েটারের জনৈক অভিনেতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অমৃতবাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ হে, আমাদের থিয়েটারে 'অনলে বিজলী' নাটকের বিজ্ঞাপন দেখিতেছি, বিষয়টা কি?" উক্ত অভিনেতা বলিলেন,— 'অনলে বিজলী' নাম গ্রন্থকার একটু ঘুরাইয়া দিয়াছেন, বিষয়টা হ'চ্ছে

—সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।” অমৃতবাবু বলিলেন,—“বটে! দাঁড়াও, আমিও “লক্ষ্মণের শক্তি শেল” নিয়ে একখানা নাটক লিখ্‌ছি, তার নাম দেব—‘বগলে অংশুমালী।”

আবু হোসেন ও আমীর হোসেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে ‘আবু হোসেন’ অভিনয় দেখিতে পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর হোসেন সাহেব আসিয়া রয়েল বক্সে বসিয়াছেন। ‘আবু হোসেন’-বেশী নাট্যাচার্য্য হাস্য-রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “আজ অভিনয় হবে কি—‘আবু হোসেস।” মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—“এই চুল দিয়েছে কে—বাবু হোসেন আর আজ দেখতে এসেছেন কে—আমীর হোসেন?” এই বলিয়া রয়েল বক্সের দিকে চাহিয়া সুদক্ষ অভিনেতার সুনিপুণ ভঙ্গিতে হাস্যরসের সহিত এরূপ কৌশলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন করিলেন যে, তাহা কেবল অর্দ্ধেন্দুশেখরেরই সম্ভব।

নাচালে কা’কে?

রমানাথবাবু গিরিশবাবুর পরিচিত, মাঝে মাঝে পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। একদিন তিনি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়াছেন। গিরিশবাবু বলিলেন,—“কি হে রমানাথ যে?” নূতন বই-টই আর কিছু লিখ্‌লে নাকি?” রমানাথবাবু বলিলেন,—“আজ্ঞে! ‘কমলে-

কামিনী' নামে একখানা অপেরা লিখেছি।" গিরিশবাবু বলিলেন,—"নাচ্ গান না হ'লে তো অপেরা হয় না। শ্রীমন্তের বাড়ীতে তো তার 'লহনা', 'খুল্লনা' দুই মা, ছেলেটীকে নিয়ে স্বামীবিরহে দুঃখে তারা দিন কাটায়, তা হ'লে নাচালে কা'কে? "নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রমানাথবাবুকে বলিলেন,—"বই ছাপ্তে দিয়েছ নাকি?" রমানাথবাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছাপা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।" অমৃতলালবাবু গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মশায়, রমানাথ নাচের ব্যবস্থা ক'রেছে।" গিরিশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কি রূপ?" অমৃতলালবাবু বলিলেন, "যখন রমানাথ বই ছাপ্তে দিয়েছে তখন অবশ্যই টাকা আদায়ের জন্য ছাপাখানার বিল রমানাথের বাটীতে আস্বে। সেই বিল দেখ্লেই রমানাথের বাবা নাচতে আরম্ভ করবে।"

কিছু নয়—ও গো-হাঁচি!

হাস্য-রসার্ণব অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেই দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তিনি অভিনয়কালে নাটক ছাড়া তাল মাফিক বুলিচালি দিয়া দর্শকগণকে হাসাইয়া অস্থির করিতেন। মাঝে মাঝে দর্শকগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতেন। একদিন তিনি অভিনয় করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনৈক দর্শক হঠাৎ হাঁচিয়া ফেলায় আর একজন দর্শক অর্দ্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,- "যাবেন না, হাঁচি প'ড়েছে।" অর্দ্ধেন্দুবাবু ফিরিয়া বলিলেন,—"কিছু নয়, ও গো-হাঁচি, নাকে খড় আটকেছে।"—

ও বেটা, তুমি ওখানে ব'সে আছ?

একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু কোন একখানি নাটকে অভিনয়কালীন 'হরে' ভৃত্যকে ডাকিতেছেন। ভৃত্যের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইতেছে, এ কারণ অর্দ্ধেন্দুবাবু ক্রোধের ভানে 'হরে' 'হরে' বলিয়া নেপথ্যাভিমুখে চিৎকারকরিতেছেন। এমন সময় একজন দর্শক গ্যালারি হইতে রঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন —"আজ্ঞে যাই।" অর্দ্ধেন্দুবাবু দর্শকটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনয়-ছলে বলিলেন, "ও শুয়োর ব্যাটা, তুমি ওখানে ব'সে আছ?" দর্শক-মণ্ডলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাচাল দর্শকটী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

এক দৌড়ে বাগবাজার!

গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য গিরিশবাবুর প্রতিবাসী, কথকতা করিতেন। তাঁহার পুত্র রসিকমোহনের থিয়েটার করিবার বিশেষ ঝোঁক। বন্ধু-বান্ধবগণকে এবং নিকটবর্ত্তী টোলের ছাত্রগণকে নানা নাটক হইতে নানা স্থান আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন,— "দেখিও, আমি থিয়েটারে ঢুকিলে একজন নামজাদা অভিনেতা হইব।" বন্ধু-বান্ধবেরাও রসিকমোহনের কথা একেবারে অবিশ্বাস করিতেন না, বরং থিয়েটারে যাইতে উৎসাহই দিতেন।

রসিকমোহন পিতাকে ধরিয়া বসিলেন, গিরিশবাবুকে বলিয়া আমাকে থিয়েটারে ঢুকাইয়া দিন। পুত্র থিয়েটারের অভিনেতা হয়, কথক মহাশয়ের এ ইচ্ছা ছিল না। তিনি প্রথমে ক্রুদ্ধ, পরে বিরক্ত

এবং শেষে সংযত হইয়া নানারূপ বুঝাইলেন, পুত্র কিন্তু কোনও-রূপে বুঝিলেন না। জ্বালাতন হইয়া অবশেষে কথক মহাশয় গিরিশবাবুকে আসিয়া ধরিলেন। গিরিশবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার পুত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাকে ব্রাহ্মণের কার্য্যে ব্রতী করুন, থিয়েটারে গিয়া যদি বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তাহ'লে দু'কুলই নষ্ট হবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন ফিরিলেন বটে, কিন্তু কয়েক-দিন পরে আবার আসিয়া গিরিশবাবুকে ধরিয়া বসিলেন। বিশেষ অনুরোধে গিরিশবাবু রসিক-মোহনকে থিয়েটারে লইলেন।

কিছু দিন পরে, নূতন নাটকে একটী দূতের ভূমিকা লইয়া রসিক-মোহন রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি ভীরু ছিলেন না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইবামাত্র বিচিত্র সমুজ্জ্বল রঙ্গালয়ের অসংখ্য দর্শকের সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার বক্ষ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন এবং পদদ্বয়ের ঘন ঘন কম্পনে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। দূতের এইরূপ বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া দর্শকগণ উচ্চ হাস্যে রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

রসিকমোহন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আর বাক্য ব্যয় না করিয়া রঙ্গ-মঞ্চ হইতে সটান প্রস্থান করিলেন। রঙ্গালয়ের ভিতরের অভিনেতৃগণের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দূতের পরিচ্ছদ-পরিহিত রসিকমোহন দ্রুত থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া একেবারে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক থিয়েটারের লোক—"পোষাক নিয়ে কোথায় যান —পোষাক প'রে কোথায় যান"—বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইলেন।—আর কি রক্ষা আছে! দৌড়—দৌড়, এমন দৌড় যে

বিডন ষ্ট্রীট হইতে ছুটিয়া একেবারে বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া পতন ও মূর্চ্ছা !

পরদিন প্রাতে কথক মহাশয় দূতের পোষাক হস্তে গিরিশবাবুর বাটীতে আসিয়া বলিলেন,—"রসিকমোহনের থিয়েটারের সখ মিটিয়াছে, পোষাকটী থিয়েটারে পাঠিয়ে দেবেন ।"

মাংস নামিয়ে দেখি, হাঁড়ি নাই।

ত্রৈলোক্যবাবু নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল অতুলবাবুর মুহরী ছিলেন। গিরিশ বাবুর বাটীতেই তিনি থাকিতেন। ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নানা কার্য্যে প্রায়ই তাঁহাদের ম্যানেজার গিরিশবাবুর বাটীতে আসিতেন, এই সূত্রে তাঁহাদের সহিত ত্রৈলোক্যবাবুর আলাপ পরিচয় হওয়ায়, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি থিয়েটারে যাইতেন। এইরূপ কিছুদিন যাতায়াতের পর, যে কোনও একখানি নাটকে একটী part পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে ত্রৈলোক্যবাবু বিশেষ অনুরোধ করিতে থাকেন। সে সময়ে গিরিশবাবুর 'ধূমকেতু' নাটকের রিহারস্যাল আরম্ভ হইয়াছে। ত্রৈলোক্যবাবুকে পাচকের ভূমিকা দেওয়া হইল। পাচকের মাত্র এই ক-একটী কথা,—"মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই।"

ত্রৈলোক্যবাবু সদাসর্ব্বদা উক্ত লাইনটি আওড়াইতে থাকেন। রিহারস্যালে আসিয়াই একবার নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবুকে বলেন, —"শুনুন তো আমার পার্টটা একবার," কখনো বা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা

অমৃতলাল মিত্রকে, বলেন,—"দেখুন তো আমার বলায় কোন দোষ হ'চ্চে কি না ?" বস্তুতঃ ব্যস্ত হইয়া সকলে যখন একবাক্যে স্বীকার করিলেন, অভিনয় তাঁহার নিখুঁত হইবে, তখন তিনি সুস্থ হইলেন ! শুক্রবার ড্রেস রিহারস্যালের দিন, ত্রৈলোক্যবাবু থিয়েটারে যাইলেন না, জনৈক অভিনেতা মারফৎ বলিয়া পাঠাইলেন,—"অমৃতবাবুকে ভাবিতে বারণ করিও, কাল গিয়া একেবারে অভিনয় করিব, আমার সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

তৎপর দিবস শনিবার রাত্রি ৯টায় থিয়েটারে যথারীতি কনসার্ট বাজিল,—ড্রপ উঠিল, অভিনয় আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের তৃপ্ত্যর্থে দাতাকর্ণ ও পদ্মাবতী করাৎ দিয়া বৃষকেতুকে কাটিয়া পাচককে রন্ধন করিতে দিলেন। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ-বেশী বিষ্ণু আসিয়াছেন। এমন সময় পাচক-বেশী ত্রৈলোক্যবাবু রঙ্গমঞ্চে দ্রুত প্রবেশ করিয়া,— "মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই"—ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মাংস নামিয়ে দেখি হাঁড়ি নাই।" দর্শকের হাস্যধ্বনিতে রঙ্গালয়ের ছাদের করগেট পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

এলো এলো একপাল যুধিষ্ঠির।

বেঙ্গল থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'অশ্রুমতী' নাটকে, বিহ্বল (nervous) হইয়া "মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত" বলিতে গিয়া "দ্বারসিংহ মানে উপস্থিত" বলিয়াছিলেন।

রঙ্গালয়ে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গিরিশচন্দ্র যে সময় ষ্টার থিয়েটারে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে দক্ষের ভূমিকা অভিনয় করিতেন, সে সময় যজ্ঞস্থলে দক্ষের নিকট যৎকালে একে একে দূতগণ আসিয়া যজ্ঞ-ধ্বংসের সংবাদ দিত, তৎকালে দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রের ভীষণ মূর্ত্তি ও রক্তচক্ষু দেখিয়া দূতগণ এরূপ ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িত, যে বাক্য নিঃসরণ দূরে থাক, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতেই সাহস করিত না।

নেপথ্যে "হর হর হর!" ধ্বনি উঠিতেছে; রঙ্গমঞ্চে মহারাজ দক্ষ "শুনি ভীষণ হুঙ্কার" বলিয়া রোষ-কষাইত নয়নে চতুর্দ্দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—এমন সময় প্রথম দূত আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে বলিতে হইবে,—

"মহারাজ, প্রাণ যদি চাও, পলাও পলাও—এলো এলো ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল ইত্যাদি।" দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রের প্রবল আগ্রহব্যঞ্জক নয়ন-ভঙ্গী ও বদন মণ্ডলের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দর্শনে দূত কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট-স্বরে বলিল,—"মহারাজ এলো—এলো—একপাল—রাজা যুধিষ্ঠির—"

অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া ভিতর হইতে প্রম্পটারবাবু দূতকে ডাকিতে লাগিলেন,—"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।" কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় দূতও সেই সুরে বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।"

ভাঁড় নই—খুরি !

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' নামক নাটক অভিনয় হইতেছে। বরুণচাঁদ-বেশী অর্দ্ধেন্দুশেখর রজ্জুবদ্ধ সুষেণকে রাজ-সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন,—"প্রাণনাথকে প্রেম-ডুরিতে বেঁধে টানাটানি ক'রছি।" রাজা জয়সেন বলিলেন,—"আরে এ কি বলে,—ভাঁড় না কি ?" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"মহারাজ, ভাঁড়—অতবড় নই, একখানি ছোট খুরি !"

ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' নাটকের যেরূপ সুন্দর অভিনয় হইয়াছিল, অর্থাগমও সেইরূপ যথেষ্ট হইত। বিশেষতঃ লব কুশ শিশু দুইটীর অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণের আশা মিটিত না, পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইত না, অনেকে দুই তিন বার করিয়া উক্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিতেন। ন্যাসান্যাল থিয়েটারের স্বত্ত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ জহুরী মহাশয় লবকুশের সমধিক আকর্ষণ বুঝিয়া গিরিশবাবুকে বলিলেন, "বাবু, যব্ দোসরা কিতাব লিখ্‌গে, তব ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।" জহুরী মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গিরিশবাবু পুনরায় লব কুশের অবতারণার জন্য 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' নাটক লিখেন।

পুরাতনে হতাদর।

আমাদের রঙ্গালয়ের প্রধান একটি দোষ, যেরূপ সাজসজ্জা ও দৃশ্য-পটাদির আড়ম্বর করিয়া নাটকাদি প্রথমে খোলা হয়, তাহার পর সে নাটক যত পুরাতন হইতে থাকে, তাহার সর্ব্ব সৌষ্ঠব রক্ষার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আর লক্ষ্য থাকে না।

ব্রজবিহারী সোম নামে গিরিশবাবুর জনৈক প্রতিবাসী ও বিশিষ্ট বন্ধু মফঃস্বলের সাব্‌জজ ছিলেন; ৺শারদীয়া পূজার বন্ধে কলিকাতায় আসিয়া তিনি একদিন 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। অভিনয়ান্তে গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"কি হে, তোমরা যখন প্রথম 'পলাশীর যুদ্ধ' খুলেছিলে, কি সুন্দর নিখুঁত অভিনয়ই দেখিয়েছিলে, আর আজ এ কি দেখলুম!—তখন রণস্থলে রাশি রাশি মৃত সৈন্যের মধ্যে গোলার আঘাতে ভগ্নপদ মোহনলালকে শায়িত দেখে মনে কি ভাবই না জাগতো!—আর আজ দেখলুম কিনা,—রণস্থলে মোহনলাল একটি ঢালের উপর মাথা রেখে প'ড়ে আছে।"

WHO COMES THERE?

এমারেল্ড থিয়েটার একদা মফঃস্বলে অভিনয়ার্থে নৌকাযোগে যাইতে-ছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দেখা গেল, দূরে একখানি ছিপ তাঁহাদের দিকে সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মাঝিরা সভয়ে বলিল,—"হুজুর, ওরা ডাকাত, ছিপে চ'ড়ে নৌকা মেরে বেড়ায়।" সম্মুখে রাত্রি, তাহাতে জলপথ, আবার ডাকাত,—নৌকায় যে কয়েক-

জন অভিনেতা ছিলেন, চিৎকার করিয়া উঠিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুও সেই নৌকায় ছিলেন, তিনি গম্ভীর হইয়া অভিনেতাদের বলিলেন, "চ্যাঁচাসনি, যা বলি শীগ্‌গির কর্। নৌকায় ড্রেসের বাক্স আছে, চটপট্ সাহেব আর কনষ্টেবলের পোষাকগুলো বার করে ফেল্।" সৌভাগ্য-ক্রমে সেই নৌকাতেই ড্রেসার ছিল, সে তৎক্ষণাৎ পোষাক বাহির করিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপদেশমত তাঁহাকে সাহেব ও কয়েকজন অভিনেতাকে কনষ্টেবল সাজাইয়া দিল। ষ্টেজে অভিনয়ার্থে একটী নকল বন্দুক ছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবু সেই নকল বন্দুক হস্তে কনষ্টেবল-বেশী অভিনেতাগণকে লইয়া নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে ডাকাতদের ছিপও কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সাহেববেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় মিলিটারি কায়দায় বন্দুক তুলিয়া বলিলেন,—"Who comes there ?" কথাটা পুনরায় উচ্চারিত হইতে না হইতে জলদস্যুরা ইহাদের জল-পুলিস ভাবিয়া দ্রুত বেগে ছিপ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। দস্যুদল চক্ষুর অন্তরাল হইলে নৌকা মধ্যে হাসির একটা হর্‌রা পড়িয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই অদ্ভুত কাণ্ড হইতে দেখিয়া মাঝিরা অবাক্ বিস্ময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘাড়ের ব্যথাটা আজ সেরে গেল।

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মীরকাসিম' ঐতিহাসিক নাটকদ্বয়ে উমিচাঁদ ও খোজা পিক্রুর ভূমিকাভিনয়ে প্রবীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত

হরিদাস দত্ত মহাশয় নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত। হরিবাবু ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সীতাহরণ' নাটকাভিনয়ে সুপার্শ্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাবণ যে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে সময়ে গৃধ্ররাজ সুপার্শ্ব বৃহৎ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া রাবণকে গ্রাস করিতে আসিত। দৃঢ় লৌহ তার অবলম্বনে সুপার্শ্ব শূন্য-পথে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিত। হঠাৎ একদিন তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় দীর্ঘ টিনের মুখোস পরিহিত সুপার্শ্ব-বেশী হরিবাবু, ষ্টেজের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ঠিক যেন উড়িয়া গিয়া নেপথ্যে হারমোনিয়ামের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়েন, ও তথা হইতে নীচে পতিত হন। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় সকলেই ভূপতিত হরিবাবুর নিকট ছুটিয়া আসিলেন! 'জল আন'—'ডাক্তার ডাক্'—শব্দ পড়িয়া গেল! কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়া গেল, কেহ জল আনিল।

হরিবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিলেন,—"আঃ— বাঁচলুম—আমার ঘাড়ের ব্যথাটা এতদিনের পর আজ সেরে গেল।" বহুদিন হইতে ঘাড়ে একটা বেদনা, হইয়া হরিবাবুর ঘাড়টা একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল, সেদিন কেমন সুকায়দায় পড়িয়া—তাঁহার সেই বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়।

মুলতান তাবিজ।

'রহস্য-প্রতিভা' প্রণেতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের প্রণীত 'কাবুল কঙ্কণ' নামক একখানি নাটক, কোন একটি প্রাইভেট

থিয়েটার, ন্যাসান্যাল থিয়েটার ভাড়া লইয়া একরাত্রি তথায় অভিনয় করেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু উক্ত প্রাইভেট থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলেন,—"কাবুল কঙ্কণ" তো হ'লো, এবার কি 'মুলতান তাবিজ' অভিনয় ক'রবে?"

আগে টিকি টেনে দেখ্‌বো!

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ে সমস্ত বঙ্গদেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, ভক্তিরসে দেশ যেন মাতিয়া উঠিল। বিশেষ অনুরোধে একদিন বিনামূল্যে বৈষ্ণবগণকে 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় দেখাইবার কথা হয়। থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা বলিলেন,— "বৈষ্ণবেরা বিনা মূল্যে থিয়েটার দেখিতে পাইবে শুনিয়া, সেদিন তো অনেকে টিকি এঁটে বৈষ্ণব সেজে এসে ফাঁকি দিয়ে থিয়েটার দেখে যেতে পারে।" প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বলিলেন,— "ভাবনা কি, আমরা আগে টিকে টেনে দেখ্‌বো, তারপর ঢুকতে দেব।"

গয়না কাটলো, গায়ে আঁচড়টী লাগ্‌লো না।

সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেঙ্গল থিয়েটারে 'মেঘনাদ বধ' নাটকে মেঘনাদের ভূমিকা

অভিনয় করিতেন। যুদ্ধ-যাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট বিদায়-দৃশ্যে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত মেঘনাদ—বেশী কিরণবাবু "কেন-মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে রক্ষোবৈরী" বলিয়া এমনই সবেগে তরবারি কোষমুক্ত করিলেন, যে, সূতা কাটিয়া গিয়া মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ষ্টেজে পড়িয়া গেল।

অভিনয়ান্তে ষ্টেজ হইতে ভিতরে আসিয়া মন্দোদরী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"আর আমি থিয়েটার ক'রতে চাই না, আর একটু হ'লেই হাতখানা উড়ে যেত।" এমন সময়ে কিরণবাবু আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখ্‌লে তো হাতের তারিফ, গয়না কাট্‌লো কিন্তু গায়ে আঁচড়টী লাগ্‌লো না!"

তোর কান্না শুনে শেয়াল কুকুরে কাঁদছে!

মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবু হোসেন' অভিনয় হইতেছে। রক্ষিগণ বন্ধ করিয়া আবু হোসেনকে পাগলা গারদে লইয়া যাইতেছে। আবুর মাতা "ও বাপরে—আমার কি হ'লো রে!"—বলিয়া কাঁদিতেছে।

কয়েকটী দর্শক রঙ্গ করিয়া এই কান্নার সুরে কাঁদিতে লাগিল। আবু হোসেন—বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন,—"মা, আর কাঁদিস নে, তোর কান্না শুনে শেয়াল কুকুরে কাঁদ্‌ছে।"

আমি ডিস্‌মিস নেব না।

জনপ্রিয় অভিনেতা হাস্যার্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুবিখ্যাত নাট্যরথী, স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়কালে, যাত্রার দলে প্রহসন লিখিয়া দিতেন, এবং যে দলে তাঁহার প্রহসনের অভিনয় হইত, তিনি তথায় গিয়া তাহা শিখাইয়া দিয়া আসিতেন, এজন্য মাঝে মাঝে তিনি থিয়েটারে অনুপস্থিত হইতেন।

কয়েকদিন কামাইয়ের পর একদিন অভিনয় রাত্রে থিয়েটারে আসিয়া অক্ষয়বাবু গ্রিণ-রুমে সাজিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক অভিনেতা আসিয়া বলিলেন,—"বাবু আপনাকে ডিস্‌মিস ক'রেছেন, আপনি সাজ্‌বেন না।" অক্ষয়বাবু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পোষাক পরিতে লাগিলেন। কোনও জবাব না পাইয়া অগত্যা উক্ত অভিনেতা অমরবাবুকে গিয়া সংবাদ দিলেন। অমরবাবু বিরক্ত হইয়া সুবিখ্যাত নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুকে দিয়া পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন।

নেপেনবাবু ফিরিয়া আসিয়া অমরবাবুকে বলিলেন,—"আপনি ডিসমিস্ ক'রলে কি হবে, সে বল্লে—'আমি ডিস্‌মিস্ নেব না।"

অদ্ভুত জবাব শুনিয়া অমরবাবুর গাম্ভীর্য্য ছুটিয়া যাইল, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। গুণগ্রাহী অমরবাবু হাস্যরস-চাতুর্য্যে অক্ষয়-বাবুকে অন্তরে ভালোবাসিতেন এবং অক্ষয়বাবুও তাহা অন্তরে অন্তরে জানিতেন।

NATURAL অভিনয়।

সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত। 'কপালকুণ্ডলা'য় কাপালিক, 'নীলদর্পণে' তোরাপ, 'বিষাদে' মাধব প্রভৃতি কতকগুলি ভূমিকাভিনয়ে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহ তাঁহা অপেক্ষা অধিক যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ প্রতিভাবান অভিনেতা, সেইরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ রঙ্গ-রহস্য করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাগাইতেন।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'মেঘনাদ বধ' নাটকাভিনয়ে মতিলাল-বাবু বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত নাটকের ড্রেস রিহারস্যাল হইয়া যাইবার পর মতিবাবু নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার অভিনয় তোমার কি রকম লাগলো?" রসরাজ অমৃতবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"অভিনয় চমৎকার ক'রেছ, কিন্তু Natural হয় নাই।" মতিলালবাবু বলিলেন,—"কি রকম? Unnatural হ'লে কি গিরিশবাবু ব'লতেন না!" অমৃতবাবু বলিলেন,—"জানি না, বোধ হয় তিনি অতটা খেয়াল করেন নাই।" মতিলালবাবু বলিলেন,—"তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না, ভেঙ্গেই বল না।" অমৃতলালবাবু আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"দেখ, বিভীষণ যে ধার্ম্মিক, শান্ত-শিষ্ট তা সকলেই জানে। কিন্তু জাতিতে তো রাক্ষস বটে। তোমার অভিনয়ে সেই জাতীয় ভাবের একেবারে অভাব দেখলুম্‌। যেমন উৎকৃষ্ট অভিনয় করলে, সেই সঙ্গে যদি রাক্ষসের ভাব দেখাতে পারতে, তা হ'লে

অভিনয় বড় স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'ত।" মতিলালবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ঠিক ব'লেছ, দেবতা ও রাক্ষসের অভিনয়ের ভাব ও ভঙ্গি মনুষ্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, এটা আমার প্রায়ই মাথায় ঠেকে। যাই হোক, একথা নিয়ে আর পাঁচ কান ক'রো না, আমি অভিনয় রাত্রে একেবারে রাক্ষসের জাতিগত ঠিক ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে, দর্শক তো দূরের কথা, গিরিশবাবুকে পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়ে দেব।" অমৃতবাবুও নির্জ্জনে তাঁহাকে এই ভঙ্গি-শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

জনাকীর্ণ রঙ্গালয়ে 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় হইতেছে। রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়া চিত্ররথ ইন্দ্রজিত বধার্থে ইন্দ্র-প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিল। রাম ও লক্ষ্মণ সবিস্ময়ে অস্ত্রাদি দেখিতেছেন,এমন সময়ে বিভীষণ-বেশী মতিবাবু এমন এক বিকট হুঙ্কার ছাড়িলেন যে, সম্মুখে রামচন্দ্র-বেশী গিরিশবাবু ও লক্ষ্মণ-বেশী মহেন্দ্রলাল বসু পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর—"হের খড়্গ রঘুমণি, অগ্নি শিখা সম ধাঁধিছে নয়ন এ ঘোর নিশীথে।" বলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া চক্ষু দুইটী বিকট করিয়া এম্‌নি অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিলেন যে, দর্শকগণ মধ্যে একটা হাস্য-কোলাহল উঠিবার উপক্রম হইল। গিরিশবাবু মতিবাবুর এই অদ্ভুত অভিনয়-তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া, উপস্থিত কেলেঙ্কারী নিবারণের নিমিত্ত, যে সময়ে মতিবাবু হুঙ্কার ও অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে দর্শকগণ দেখিতে না পান, এইরূপ ভাবে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করিলেন।

সে-দৃশ্য অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া গিরিশবাবু মহাক্রুদ্ধ হইয়া

মতিলালবাবুকে বলিলেন,—"নেশা ক'রে এসেছ না কি,—কি মাত্ লামিটে আজ ক'চ্ছিলে? যদি আড়াল ক'রে না থাকতুম, তা'হলে আজ একটা তো কেলেঙ্কারীর চরম ক'রতে!" মতিলাল-বাবু কোনরূপ অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—"কি দোষ হ'য়েছে বলুন? বিভীষণ তো রাক্ষস,—রাক্ষসের জাতিগত ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে অভিনয় natural করবার চেষ্টা ক'রেছি।" মতিবাবুর এই নির্ভয় উত্তর এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে এইরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া গিরিশবাবুর সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে,—বোধ হয় ভুনিবাবু কি একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে! তখন তিনি ভুনিবাবুকে (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুকে) ডাকিলেন। ভুনিবাবু তখন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতাগণকে হাসিতে দেখিয়া এবং অমৃতলালবাবুর সন্ধান না পাইয়া, তখন মতিবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিবার জন্য ভুনিবাবুর এই কারসাজি! ক্রোধে তিনি গিরিশবাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তুমি ভুনিবাবুর কথা শুনলে কেন? কই অমৃতকে তো কিছু বলে নাই। অমৃত (অমৃতলাল মিত্র) তো রাবণ সেজেছে, সেও তো রাক্ষস,– সে তো কই হুঙ্কারও ছাড়্লে না—এঁকে বেঁকে রাক্ষসের জাতিগত ভাব ভঙ্গিও দেখালে না।" তখন মতিবাবু অমৃতবাবুর তীব্র কৌতুক বুঝিয়া লজ্জায় নতমুখ হইয়া রহিলেন।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে

আর একবার মফঃস্বলে অভিনয়ার্থে গিয়া ইঁহারা মতিলালবাবুর সহিত বেশ রঙ্গ করিয়াছিলেন। মতিলালবাবু বাটী হইতে তাঁহার 'একলু' নামক হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

অমৃতলালবাবু প্রভৃতি কয়েকজন গুপ্ত পরামর্শ করিয়া উক্ত 'একলু'কে বলিলেন,—"তোমার কাজকর্ম্ম দেখে আমরা বড় খুসী হ'য়েছি, এই এক টাকা বক্‌সিস্ নাও, দরকার হ'লে তামাক-টামাক দিও। আর দেখ, তোমার 'একলু' নামটা বড় আচ্ছা নয়, আজ থেকে তোমার নাম রাখলুম,—'চামচিকে'। যখনই 'চামচিকে' বলে ডাকবো, জবাব দেবে; বুঝলে?" একলু খামকা এক টাকা বক্‌সিস পাইয়া আনন্দে বলিল,—"যো হুকুম মহারাজ!"

যখনই তাঁহারা 'চামচিকে' বলিয়া ডাকেন, একলু তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—"হুজুর!" মতিলালবাবু প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন,—'একলু'কে এরা 'চামচিকে' ব'লেই বা ডাকে কেন? আর এ বেটাই বা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কেন?

এইরূপ ভাবে দুই এক দিন যায়। একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন,—'চামচিকে' বলিয়া ডাকিলেই একলু যখন সাড়া দেয়, অন্যান্য অভিনেতারা তখন মুখ ফিরাইয়া হাসিতে থাকে। ঠিক কারণ বুঝিতে না পারিলেও তিনি কিন্তু বিরক্ত হইলেন। থিয়েটারের চাকর থাকিতে তাঁহার নিজের চাকরকে লইয়াই বা খাটান হয় কেন? আবার নাম রাখা হ'য়েছে চামচিকে, একটা অতি কুৎসিৎ নাম! লোকে কথায় বলে,—"ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।" ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, এই

কথাটী বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, – এ বেটা তো আমার গোলাম —এর নাম যদি 'চামচিকে' হয়, তা'হলে তো আমি 'ছুঁচো !' বুঝেছি বুঝেছি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা—ষড় করে আমায় ছুঁচো বলা হ'চ্চে !— 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা'—বলিয়া লাঠি হস্তে বন্ধুগণকে তাড়া করিলেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল।

তোৎলা অভিনেতা।

জনৈক ব্যক্তি এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করিতে আসিয়াছেন। রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি আর কোথাও অভিনয় ক'রেছিলেন ?" বাবুটী বলিলেন,—"হ্যাঁ, ক-ক-ক-ক'রেছি বৈকি, প্রাইভেট থিয়েটারে 'মে-মে-মেঘনাদ বধে' রা-রা-রা-রাবণ সেজেছি।" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"দেখ্ছি আপনি তোৎলা, কি ক'রে অভিনয় ক'রবেন ?" বাবুটী বলিলেন,—"অ-অ-অ-অভিনয় কর্বার সময় কথা ঠেকে না।" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনার রাবণেরই acting একটু করুন দেখি।"

ভদ্রলোকটী আরম্ভ করিলেন ঃ

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা" "হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে যখন "বনের মাঝারে যথা শাখা-দলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি"তে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন 'কাঠুরিয়া' উচ্চারণের সময়'কাঠুরিয়ার' 'ঠ' এ এমন ঠেকিয়া গেল যে, ভদ্রলোক মুখে ক্রমাগত "কা কা কা" করিয়া কুলাইতে না পারিয়া

অবশেষে, কুঠার হস্তে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটিবার ভঙ্গিতে এমন দ্রুত বেগে হস্তদ্বয় সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার তৎকালীন রক্তবর্ণ চক্ষু ও বিকৃত বদন দেখিয়া সমবেত অভিনেতৃবর্গ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

খোদার উপর কারসাজি।

মিনার্ভা থিয়েটারে যে সময়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের, 'সীতা-রাম' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন,—ক্লাসিক থিয়েটারে নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথও সে সময়ে 'সীতারাম' নাট্যাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। সেই সময়ে একদিন 'মহাভারত', —নাট্যকার সুকবি স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষীয়কে বলেন,—"আপনারাও 'সীতারাম' অভিনয় করুন না?" তিনি উত্তরে বলেন,—"আমরা তো সীতারাম, বহু দিন পূর্ব্বে 'বেঙ্গলে' অভিনয় করেছি, আমরা একটু নূতনত্বও ক'রে ছিলুম।" প্রফুল্লবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ?" তিনি বলিলেন,—'বঙ্কিমবাবু জয়ন্তীকে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমরা ভাবলুম, একটা সুন্দরী যুবতী, চিরকালটাই কি গেরুয়া পরে চিমটে ঘাড়ে ক'রে বেড়াবে,—তাই তার একটা হিল্লে ক'রে দিয়েছিলুম। মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটা জয়ন্তীর বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলুম।"

আমরা ডাল ট'কে না গেলে খেতে পারি না।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয়ের বরাবর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত রাত্রিব্যাপী থিয়েটার করা সংক্রামক হইয়া উঠিল, সে সময়ে একদিন সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর (পল্টুবাবু) মহাশয় অমৃতবাবুকে বলেন,—"ম'শায়, আপনারা ভোর পর্য্যন্ত থিয়েটার করেন না কেন?" অমৃতলালবাবু বলিলেন,—"আপনারা কি জানেন না, আমরা ডাল ট'কে না গেলে খেতে পারি না?"

আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে দীনবন্ধুবাবুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হইতেছে। হরবিলাসবাবুর বৈঠকখানায় জাল অরবিন্দকে লইয়া হুলস্থুল পড়িয়াছে। হরবিলাস-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিতেছেন,— "ভোলানাথবাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তারপর কপালে যা থাকে তাই হবে।" নদের চাঁদ বলিল,—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনই পুলিশ ইনস্পেক্টার, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ ও দুইজন কনেষ্টোবলের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার কথা।"

সকলেই আসিল, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। দর্শক-গণ আগ্রহের সহিত প্রতি মূহূর্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অথচ যজ্ঞেশ্বরের দেখা নাই। ষ্টেজ dull হয়ে যায় দেখিয়া হরবিলাস-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু, পুলিশ ইনস্পেক্টারকে বলিলেন,—"জমাদার

সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক; (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।"

এই সময়ে দর্শকগণ মধ্যে যথার্থই বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে ছিল, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই রসিকতায় সমস্ত ঢাকিয়া গেল।

হুজুরকা তো হুকুম নেহি হ্যায়।

ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্তাধিকারী এবং বিজিনেস্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়, থিয়েটারে নূতন হিন্দুস্থানী বেহারা নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন,—"তোম থিয়েটারকা অন্দর মে কাম করো। যো বাবুলোক রূপ-উপ ধরেগা, ওহি বাবুলোককো তামাকু দেওগে।"

হরিবাবুর উপদেশ মত বেহারা যাহাদিগকে অভিনয়ার্থে সাজিতে দেখে, তাহাদিগকে তামাক দেয়। শশীবাবু এখন ভিতরে তবলা বাজান, তিনি তো সাজেন না;—শশীবাবু বেহারাকে তামাক দিতে বলিলেন। বেহারা তাহা কর্ণপাত না করিয়া অন্যান্য অভিনেতাগণকে তামাক দিতে থাকে। শশীবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বেহারাকে পুনরায় বলিল,—'ব্যাটা শুন্‌তা নেই, তামাকু দেও।" তখন বেহারা বলিল,—"কাহে দিক কর্‌তা হ্যায়, হুকুম নেহি।" ইহাতে শশীবাবু ক্রোধে ও অপমানে উন্মাদের মত হরিবাবুকে গিয়া বলিলেন,—"ম'শায়, আমি কি এমন অপরাধ ক'রেছি, যে, আমাকে তামাক দিতে বারণ ক'রে দিয়েছেন?"

হরিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি, তামাক দিতে বারণ করবো কেন? পুরান বেহারার অসুখ, তোমাদের কষ্ট হবে বলে নূতন বেহারার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি।" শশীবাবু বলিলেন,—"সে সকলকে তামাক দিচ্চে, কেবল আমাকেই দিচ্চে না; ব'লছে—বাবুকা হুকুম নেই।" অভিমানে শশীবাবুর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

হরিবাবু ভিতরে আসিয়া বেহারাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বেহারা থতমত খাইয়া করযোড়ে বলিল,—"এ বাবু তো রূপ-উপ নেহি ধরা, তামাকু কাহে দেঙ্গে, হুজুরকা তো হুকুম নেহি হ্যায়।" হরিবাবু তখন প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং সকলকেই তামাক দিতে হইবে, সে কথাটী বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

"আল্লা-আল্লা-হো"

ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সৈন্যগণের সমবেতকণ্ঠে "হর হর মহাদেও" বা "আল্লা-আল্লা-হো" ধ্বনি করিবার আবশ্যক হয়; কিন্তু দুই চারিজন মাত্র সৈন্য রঙ্গমঞ্চ বা নেপথ্য হইতে ঐরূপ শব্দ করায় অভিনয়ে তেমন জমাট হয় না। মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুবাবু অভিনেতৃবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যখন 'আল্লা আল্লা হো' করিবার আবশ্যক হইবে, তখন থিয়েটারে যে যেখানে যে অবস্থায় থাক, 'আল্লা' শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই 'আল্লা আল্লা হো' করিয়া উঠিবে, যে না করিবে, তাহাকে আমার কঠিন দিব্য রহিল।"

বহুদিন ধরিয়া সৈন্যগণের জয়ধ্বনিতে দর্শকগণ চমকিয়া উঠিতেন।

থিয়েটারের ভিতর কেহ হুঁকা হাতে 'আল্লা আল্লা হো' করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া 'আল্লা আল্লা হো' করিতেছে, কেহ জলের গ্লাস হাতে, কেহ কেহ বেঞ্চেতে শুইয়া, কেহ তন্দ্রাবস্থায়, কেহ কেহ বা পাইখানা হইতে 'আল্লা আল্লা হো' করিতেছে! উপায় নাই, সাহেবের কঠিন দিব্য!!

তোমার গাড়ীতে—আমার হাড়িতে কালি প'ড়ছে না।

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন কোন এক দুঃস্থ অভিনেতা নাট্যসম্রাট গিরিশবাবুকে তাঁহার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলিতেছিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, -"কেন, তোমার দাদা তো কণ্ট্রাক্টারী ক'রে বড়লোক হ'য়েছেন শুনতে পাই, তিনি কি তোমায় কোন সাহায্য করেন না?" অভিনেতাটী বলিলেন,- "আজ্ঞে, যখন তিনি দু'পয়সা উপায় ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন, তখনই তো ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়েছিলেন। আমাদের আর বড় একটা খোঁজ খবর রাখেন না; তবু সেদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলুম যদি কিছু সাহায্য করেন। তা কি বল্লেন জানেন —'এখন কাজকর্ম্মের অবস্থা বড়ই মন্দা চ'লেছে, এক রকম বেকার ব'সেই রয়েছি। ফটকের সাম্‌নে গাড়ীখানা একবার দেখে এসো না—যেন খড়ি উড়্‌চে এমন টান পড়েছে যে একটু কালি পড়্‌চে না।'"

গিরিশবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ব'লে আস্‌তে পার্‌লে না, তোমার একটু টান পড়েছে, তাই তোমার গাড়ীতে কালি পড়্‌ছে না, আর আমার দাদা—এমন অবস্থা—যে আমার হাঁড়িতে কালি পড়্‌ছে না।"

পরাণবাবুর ORIGINALITY

পরাণবাবু একজন সাহিত্যিক, অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন! উপস্থিত নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর নিকট যাতায়াত করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নাটকের পাণ্ডুলিপি শুনাইয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন। একদিন অমৃতলালবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—'পরাণবাবু, যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন, তখন ভালো ভালো দেশী-বিদেশী নাটক আগে পাঠ করুন, তাহলে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, নূতন নূতন চরিত্র-সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে পারবেন।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া অমৃতবাবু একখানি সংবাদপত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন,—পরাণবাবু জানুদ্বয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপিত করিয়া করতলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছেন!

অমৃতলালবাবু পরাণবাবুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পরাণবাবু, হঠাৎ এরূপ কাঁদ্‌চেন কেন? আপনার বাড়ীর সব কুশল তো? কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি তো?" ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে না।" অমৃতলালবাবু আরও বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"তবে ব্যাপারটা কি,আমাকে ভেঙে ব'লতে আপনার কি কোন ব্যাঘাত আছে?" পরাণবাবু পূর্ব্ববৎ ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিলেন,—"আপনাকে গুরুর ন্যায় মান্য করি। আপনি এইমাত্র কতকগুলো বড়লোকের নাটক পড়তে আজ্ঞা ক'রলেন, আমি তো কোনমতে সে

আজ্ঞা পালন ক'রতে পারবো না।'—অমৃতবাবু তখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সে তো ভালো কথাই বলেছি,—তাতে কি এমন দোষ হ'য়েছে?" পরাণবাবু করযোড়ে ও কাতর স্বরে কহিলেন,—"আজ্ঞে, পরের বই প'ড়লে আমার originality (মৌলিকত্ব) নষ্ট হ'য়ে যাবে।" অমৃতবাবু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

খোদ—দুই মুঠা।

বিডন ষ্ট্রীটের কোনও থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী একদিন অভিনয়-রাত্রে টিকিট-ঘরে প্রবেশ করিয়া টিকিট-বিক্রেতা বিহারীবাবুকে বলিলেন,—"আজ বিক্রি কেমন?" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাক্স হইতে নোট ও টাকায় দুই মুষ্টি তুলিয়া লইয়া থিয়েটার হইতে বাহির

তৎপর দিবস কেসিয়ারবাবু চিৎকার করিতেছেন,—"বিহারীবাবু কোথায়?—এখনও কি থিয়েটারে আসেন নাই? টিকিট বিক্রয়ের সব টাকা কোথায়? 'খোদ-দুই মুঠা ১৬২ ॥০ আনা'—এ কি-একটা লিখে ক্যাশ মিলিয়ে দিয়ে গেছেন?" কেসিয়ারবাবুর চেঁচামেচিতে থিয়েটারের অন্যান্য লোক আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—'খোদ দুই মুঠা ১৬২ ॥০ আনা। তাইতো ব্যাপারখানা কি?"

এমন সময় বিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেসিয়ার-বাবু রাগ করিয়া বলিলেন,—"কল্যকার টিকিট বিক্রয়ের সব টাকা

কোথায় ?—'খোদ দুই মুঠা' ব'লে কি লিখে গেছেন ?" বিহারীবাবু গত রাত্রির ঘটনাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "তখন আমি আর কি করি বলুন ? আপনি থিয়েটারে ছিলেন না,—আমি টিকিট বিক্রয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লুম, ১৬২৷৷০ আনা কম হ'চ্ছে, তাই ঐ টাকাটা 'খোদ দুই মুঠা' ব'লে লিখে, হিসাব ঠিক ক'রে রেখে গেলুম।"

তখন প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া সেখানে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়া লইলেন,—এ থিয়েটারে আর বেশী দিন চাকুরি করিতে হইবে না।

মুস্তাফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা।

হাস্যরসাবতার অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অনেকে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিতেন। কি কারণে তাঁহার এই নাম হইল, বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। মূল ঘটনাটি এই ঃ

বাগবাজারে আদি প্রতিষ্ঠিত ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে সময়ে জোড়াসাঁকো ৩৬৫নং আপার চিৎপুর রোড, মধুসূদন সান্যালের বাটীর (উপস্থিত যেখানে মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা বাড়ী) উঠান ভাড়া লইয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণ নাট্যশালারূপে অভিনয় করিতে ছিলেন,— সেই সময়ে 'দেবকার্সন' নামক একজন সাহেব কলিকাতায় 'অপেরা হাউসে' তাঁহার রঙ্গাভিনয় দেখাইতেছিলেন।

'দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা' বলিয়া তিনি অভিনয় ঘোষণা করেন, তাঁহার 'The Bengalee babu', 'Professor',

'The school master','Deva Carson in the police court' প্রভৃতি রঙ্গাভিনয় দর্শনে সাহেব মহলে আমোদের একটা তুফান বহিয়া যায়। এত ভিড় হইত যে রঙ্গালয়ে স্থান কুলাইত না। দেবকার্সন সাহেবের এই রঙ্গাভিনয় দেখিতে এত অধিক বাঙালী দর্শক 'অপেরা হাউসে' যাইতে লাগিল যে, ন্যাসান্যাল থিয়েটারের বিক্রয় কমিয়া আসিল। তখন অর্দ্ধেন্দুবাবুও 'মুস্তাফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা' বলিয়া ন্যাসান্যাল থিয়েটারের রঙ্গাভিনয় আরম্ভ করিলেন। দেবকার্সন সাহেব তাঁহার 'বেঙ্গলীবাবু' অভিনয়ে যেমন:

'I am a very good Bengalee Babu
I keep my shop at Radha bazar,
I live in Calcutta eat my dal-vat
And smoke my Hookka' ইত্যাদি

গাহিয়া বাঙালীবাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুবাবুও সেইরূপ সাহেব সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন:

'হাম বড়া সাব্ হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।
'মিষ্টার মুস্তাফী' Name হামারা,—
চাঁটগাঁওমে মেরা বিলাত॥
কোর্ট পিনি, প্যাণ্টলন পিনি,
পিনি মেরা ট্রাউজার,
Every two years new suit পিনি
Direct from Chandny bazar.

Dirty nigger hate হামারি
বড় ময়লা আছে ছোঃ ছোঃ ইত্যাদি'

তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেহালা বাজাইয়া গান করিতেন ও পলকা নাচ চালাইতেন।

দেবকার্সন সাহেবের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাল্টা জবাব পাইয়া বাঙ্গালী দর্শকদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই সময় হইতে 'মুস্তাফী সাহেব' বলিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর নাম জাহির হয়!

৬ নং বেলেঘাটা।

ষ্টার থিয়েটারে যে-সময়ে নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবুর 'তরুবালা' নাটক অভিনীত হয়, সে-সময়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেণীবাবুর কম্পাউণ্ডার হীরালালের ভূমিকায় হাস্যার্ণব অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী অভিনয় করিতেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে হীরালালের হাস্যরস ফুটাইবার তেমন কোন সুযোগ ছিল না। বেণী ডাক্তার, হীরালালকে—"তুমি একটু বাহিরে থাক, আমি একবার সিংহিদের বাড়ীর 'কেস'টা দেখে আসি" —বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। নাটকে এই স্থলে 'উভয়ের প্রস্থান' লিখিত আছে।

অক্ষয়বাবু, বেণীবাবুর সহিত প্রস্থান কালে হঠাৎ পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টা একবার দেখুন তো, কি লিখে দিয়েছেন, বুঝ্‌তে পারছিনি,—৬ নং

বেলেঘাটা না কি ?" স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেণীবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অক্ষয়বাবুর স্বকপোলকল্পিত এই রসিকতাটা বুঝিতে পারিয়া অভিনয়ছলে, কাগজখানি হাতে লইয়া যেন বিরক্তভাবে বলিলেন,—"৬ নং বেলেঘাটা কি,—বেলেডোনা ৬ অর্থাৎ 6th dilution—এটা আর বুঝতে পারো নি ?' দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। অদ্যাবধি 'তরুবালা' অভিনয়ে অক্ষয়বাবুর এই খুশিটী চলিয়া আসিতেছে।

একটু রস দিয়ে, একটু গদগদ হ'য়ে।

সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া যাঁহারা উত্তরকালে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার ও প্রথিতনামা নট স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথম। ইনি কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটা, চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে (১২৬৩ সালে) 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকে একটি স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকা লইয়া সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন। ইনি বড় অমায়িক লোক ছিলেন। ১৩০৮ সালে ইঁহার স্বর্গারোহণের সহিত বেঙ্গল থিয়েটারেরও অবসান হয়।

'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'প্রভাস-মিলন', 'নন্দ বিদায়' প্রভৃতি ভক্তি-রসাত্মক নাটকাভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিল। ভক্তদর্শকগণ প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। শেষ বয়সে বিহারীবাবু নাটকাদিই রচনা

করিতেন, বড় একটা সাজিতেন না, কিন্তু প্রতি অভিনয়-রজনীতে দর্শকদের আসনে বসিয়া, অভিনয়ের ভালোমন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। যেদিন দেখিতেন, অভিনয় তেমন জমাট হইতেছে না, দর্শকগণ কেমন উৎসাহ বিহীন হইয়া পড়িতেছে, তখনই তিনি তাড়াতাড়ি থিয়েটারের ভিতরে আসিয়া উইংসের পার্শ্ব হইতে রঙ্গমঞ্চস্থ অভিনেতৃগণকে ইঙ্গিত করিয়া (ফোকলা দাঁতে) বলিতেন,—"একটু রস দিয়ে বল বাবা—একটু গদগদ হয়ে !"

আবার দাড়ি গজালো !

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথবাবু যে-সময়ে ষ্টার থিয়েটার লিজ লইয়া অভিনয় করিতেন, নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবুও অমরবাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তথায় অভিনয় করিতেন। সে-সময় কলিকাতায় বাঙ্গালা থিয়েটারগুলিতে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিনয় হইত। অভিনেতাগণ অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কামাইয়া থাকেন। একদিন সমস্ত রাত্রিব্যাপী অভিনয় হইয়া প্রভাত হইয়া আসিয়াছে—তখনও অভিনয় চলিতেছে। অমৃতলালবাবু দাড়িতে হাত দিয়া বলিলেন,—"কাল সন্ধ্যাকালে দাড়ি কামাইয়াছি, আবার দাড়ি গজাল !"

কোনদিন এমন Clap পেয়েছেন ?

নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রথমে ভুবনবাবুর গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে

অভিনীত হয়। নাট্যরথী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কিরণবাবু যে—সময়ে ন্যাসান্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন, সেই সময় কিরণবাবু উক্ত 'মৃণালিনী'র একখানি নকল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রদান করেন। সেই কারণেই গিরিশবাবু কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মৃণালিনী' বরাবর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইত।

'মৃণালিনী'র চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যে-সময় রাজপথ দিয়া স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পশুপতিকে লইয়া মহম্মদ আলি দুইজন মুসলমান সৈন্যসহ গমন করেন, সেই সময় অদূরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আলয় দেখিয়া পশুপতি বলিয়া থাকেন,—"ঐ যে আমার গৃহ, মুসলমানেরা আগুন দিয়েছে—মনোরমা গৃহে আছে, ছাড়ো ছাড়ো—" সৈন্যদ্বয় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় পশুপতি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে যৎকালে 'মৃণালিনী' অভিনয় হয়, কিরণবাবু পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একরাত্রে উপরোক্ত দৃশ্য যে-সময়ে অভিনয় হইতেছে, পশুপতি-বেশী কিরণবাবু "ছাড়ো—ছাড়ো" বলিয়া সৈন্যদ্বয়ের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, একজন সৈন্যের এমন Feeling আসিয়াছে যে, সে কোন মতেই পশুপতিকে ছাড়িবে না। কিরণবাবু যতই বলপ্রকাশ করিতেছেন, সে ততই তাঁহাকে সজোরে জাপটাইয়া ধরিতেছে। বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কিরণবাবু শেষে অনন্যোপায় হইয়া সৈনিককে সজোরে রঙ্গমঞ্চের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলেন। সবেগে পতিত হইয়া সৈনিকের নাক মুখ ছেঁচিয়া গেল। দর্শকগণ চক্ষের

সম্মুখে এই সজীব অভিনয় দেখিয়া উল্লাসে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ড্রপ পড়িয়া যাইলে কিরণবাবু সৈনিককে ক্রোধে ভৎর্সনা করিতে গিয়া দেখেন, তখনও তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ—এমন আহাম্মুখ তুমি! দেখ দেখি এখনো রক্ত প'ড়চে!" সৈনিক কর-যোড়ে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আহাম্মুখ তো ব'ল্‌ছেন, নাক দিয়ে রক্তও প'ড়্‌চে বটে—কিন্তু আজকের play কেমন জমিয়ে দিলুম বলুন?—কোন দিন এমন clap পেয়েছেন?"

ফ্যান্সি ফেয়ারে অর্দ্ধেন্দুশেখর।

নিউইয়ার্সডে উপলক্ষে আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেনে প্রতি বৎসর ফ্যান্সি ফেয়ার হইয়া থাকে। বহুদিনের কথা, ইংরাজী লুইস-থিয়েটার তথায় অভিনয় করিবার জন্য একটী তাঁবু ফেলিয়াছিল। ন্যাসান্যাল থিয়েটারও অভিনয়ার্থে তথায় গিয়া আর একটি তাঁবু ফেলে। লুইস থিয়েটার বাদ্যাদির নানা প্রলোভনে দর্শক সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। সাহেব, মেম ও অনেক শিক্ষিত বাঙালী লুইস থিয়েটারেই যাইতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু দেখিলেন, লুইস থিয়েটার আড়ম্বর করিয়াই দর্শক আকর্ষণ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ক্লাউন সাজিয়া একটী ঘণ্টা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং সম্মুখস্থ সাহেব, মেম যাহাকে দেখিতে পাইলেন, বলিতে লাগিলেন—,

"A merry band has just come down from the moon in younder camp. come one—come all !"

মুস্তাফি সাহেবের সাজসজ্জা এবং চলন, বলন ও অভ্যর্থনার অদ্ভুত ভঙ্গিমায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দলে দলে সাহেব, মেম ও বাঙালী ন্যাসান্যাল থিয়েটারের তাঁবুতেই প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কোনটী পালা আর কোনটী সং ?

ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে আসিয়া জনৈক পল্লীগ্রামবাসী, উক্ত থিয়েটারের বিজিনেস ম্যানেজার স্বর্গীয় দুর্গাদাস দে মহাশয়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবু, আজ কি পালা হবে ?" দুর্গাদাসবাবু বলিলেন,—" 'মৃণালিনী' ও 'সীতাহরণ"। লোকটী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, কোনটী পালা আর কোনটী সং ?" দুর্গাদাসবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,— " 'মৃণালিনী,' পালা আর 'সীতাহরণ' সং।"

তিনখানা গোয়ালন্দের টিকিট দেবেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের টিকিট ঘরে আসিয়া একদিন জনৈক পল্লীগ্রাম-বাসী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, বাবু—এইখানে কি টিকিট বিক্রী হয় ?" টিকিট-বিক্রেতাবাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ, কোন্ জায়গার টিকিট নেবে ?" লোকটি বলিল,—"আজ্ঞে তিনখানা গোয়ালন্দের টিকিট দেবেন।"

আমাকে তামাক সেজে খেতে বলিস?

চোরবাগানে স্বর্গীয় গোপাললাল মিত্রের বাটীতে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় আহূত হইয়া তথায় 'নবীন তপস্বিনী' নাটকাভিনয় করেন।

উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই গুড়-তুলায় আবৃত, লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ জলধরকে বহনপূর্ব্বক চারিজন বাহক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া থাকে। আদি ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'লীলাবতী' নাটকের নদেরচাঁদ ভূমিকায় খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তন্মধ্যে একজন বাহক সাজেন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মালকোচা আঁটা, কাঁধে গামছা, গলায় মালা পরিয়া তিনি হুবহু পল্লীগ্রামের ডুলে—বাগ্দীদের ন্যায় বেশ ধারণ করিতেন।

চতুর্থ অঙ্কের ড্রপ পড়িয়া কনসার্ট বাজিতেছে, পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই তাঁহাদিগকে বাহির হইতে হইবে। যোগেনবাবু তাড়াতাড়ি উক্ত মিত্র বাটীর জনৈক ভৃত্যকে চট্ করিয়া এক ছিলিম তামাক দিতে বলিলেন। সে থিয়েটারের ভিতরে এক পার্শ্বে তামাকের সরঞ্জাম লইয়া সকলকে তামাক দিতেছিল। ভৃত্যটী যোগেনবাবুর চেহারা দেখিয়া ভাবিল,—এ লোকটা থিয়েটারের চাকর, এত বড় বাবু হ'য়েছে, যে, আমাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নিতে চায়।' তখন সে কুপিত হইয়া বলিল,—"তুই নিজে তামাক সেজে খা'না,—বড় যে বাবু হ'য়েছিস্!" সহসা একটা ভৃত্যের মুখে এইরূপ জবাব পাইয়া যোগেন-বাবু ক্রোধে—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে তামাক সেজে খেতে বলিস!"—বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। ভৃত্যটী গোঁয়ার ছিল,

সে-ও তাঁহার ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিল। আর কি রক্ষা আছে, যোগেন-বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে বিলক্ষণরূপ ঘা'কতক বসাইয়া দিলেন ; ভৃত্যও তাঁহার চুলের মুঠি ধরিল। উভয়ের মধ্যে যখন এই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও চেঁচামেচি চলিতেছে, তখন অভিনেতৃগণ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

ভৃত্য তখন যোগেনবাবুর চুলের মুঠি ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করায়, পরচুলাটি তাঁহার মুষ্টি-বদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে এবং যোগেনবাবুর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। যখন সকলে "যোগেনবাবু, ব্যাপার কি —ব্যাপার কি ?"—বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ভৃত্যটী তাঁহাকে থিয়েটারের একজন বাবু বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যোগেনবাবুর পা' দুটী জড়াইয়া ধরিল এবং বার বার মাপ চাহিতে লাগিল।

এই হাঙ্গামায় এবং যোগেনবাবুকে প্রকৃতিস্থ করিতে বিলম্ব হওয়ায়, সেদিন আর জলধরকে কাঁধে করিয়া ষ্টেজে আনা হইল না, জলধরের কোমরে শিকল বাঁধিয়া রঙ্গমঞ্চে আনিতে হইয়াছিল।

প্রথিতনামা উদার-হৃদয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন মিনার্ভা থিয়েটারে এইরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুবাজারের বিখ্যাত বড়ালদের বাড়ীতে এক রাত্রি সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-বিরচিত 'শুভ-দৃষ্টি' নাটক উক্ত মিনার্ভা থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক অভিনেতা উড়ে খানসামা সাজিয়া, বড়াল বাটীর জনৈক উড়ে ভৃত্যকে এক পেয়ালা চা দিতে বলেন। সে, রাধা-চরণবাবুকে সত্যই উড়ে ঠাওরাইয়া কটূ ভাষায় গালি দিতে থাকে।

রাধাচরণবাবু চাকরের স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে একেবারে থিয়েটারের ম্যানেজার অপরেশবাবুর সামনে আনিয়া খাড়া করেন এবং তাহার নামে তীব্র অভিযোগ করেন। ভৃত্যটীও বড়লোকের বাড়ীর খানসামা,—সেও অপমানে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অপরেশবাবু সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, যখন রাধাচরণবাবুর মাথা হইতে উড়ের পরচুলাটী তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—রাধাচরণবাবু সত্যই তাঁহার জাত-ভাই নন,—তখন ভৃত্যটী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। অবশেষে অপরেশবাবুর মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইয়া সে রাধাচরণবাবুর নিকট মাপ চাহিল এবং শুধু রাধাচরণবাবুকে নয়, সকলকেই দুধ-চিনি বেশী করিয়া দিয়া ঘন-ঘন চা সরবরাহ করিতে লাগিল।

নকলে নাকাল!

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কামিনী-কুঞ্জ' নামক একখানি গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামতারণ সান্ন্যাল মহাশয় তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চে গোপাল ভাবে যথাযথই মাখন খাইতেন।

এই সময় উক্ত থিয়েটার সম্প্রদায় দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরপ্রসাদ মহোদয়ের অভিষেক-উৎসবে আহূত হইয়া বাঁকিপুরে অভিনয়ার্থে গমন করেন। তথায় একরাত্রি 'কামিনী-কুঞ্জ' গীতিনাট্য অভিনীত হয়।

বাঁকিপুর অঞ্চল সে-সময়ে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট মাখনের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের যিনি ড্রেসার (স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র পাল) ছিলেন, তিনি কোন বিশেষ কারণে বাঁকিপুর যাইতে পারেন নাই, এ-নিমিত্ত তাঁহার স্থলে—নবীনচন্দ্র পাল নামক তাঁহার একজন আত্মীয় গিয়াছে। রামতারণবাবু বাঁকিপুরের উৎকৃষ্ট মাখনের প্রলোভনে, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—যেন তাহার জন্য রঙ্গমঞ্চে বেশী করিয়া মাখন রাখা হয়। রামতারণবাবুর উপদেশ মত নবীনচন্দ্র অনেকটা মাখন ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

অভিনয়কালে যে-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-বেশী রামতারণবাবু মাখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সহসা অপ্রত্যাশিত একটা বিকৃত আস্বাদানে বুঝিতে পারিলেন,—এ প্রকৃত মাখন নহে, নবীন পাল ঠিক মাখনের মত কি একটা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ষ্টেজে বসিয়াই "গাধা-শুয়ার" ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া নবীনচন্দ্রকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ সহসা শ্রীকৃষ্ণকে মাখন খাইতে খাইতে চঞ্চল হইয়া এরূপ কটূক্তি করিতে শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত পরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যাহাই হোক রামতারণবাবু যেমন তেমন করিয়া উক্ত দৃশ্য অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া, ক্রোধে নবীন পালকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। নবীনচন্দ্র বলিল,—"আপনি যা ইচ্ছা তাই ব'লে গাল দিচ্ছেন কেন? এ তো আর সত্যকার মাখন নয়,—ষ্টেজে তো। সব নকল ক'রে দেখাতে হয়—সবেদা, পাঁউড়ি, চুন এই সব দিয়ে ঠিক তো মাখন বানিয়ে রেখেছি।"

পরে যখন নবীন শুনিল, রামতারণবাবু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে রঙ্গমঞ্চে

বসিয়া সত্যই আসল মাখন খাইয়া থাকেন, এবং তাঁহার তৈয়ারী চুন-মিশ্রিত মাখন খাইয়া তাঁহার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে, তখন সে লজ্জায় একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল !

উঃ—বড় জ্বর !

একদিন রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে তৈল মাখিয়া স্নানার্থে চৌবাচ্চায় নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"কেমন আছেন ম'শায় ?" অর্দ্ধেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া বিকৃত বদনে এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"উঃ—বড় জ্বর !" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"সে কি ম'শায়, ভালো না থাক্‌লে কেউ তেল মেখে স্নান করে ? জ্বর কি ব'লচেন ?"

অর্দ্ধেন্দুবাবু পুনরায় সহজভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি তো কিছু বলিনি ম'শায়, আমি তোফা চান ক'রতে যাচ্চি, আপনিই এসে বল্লেন,—'কেমন আছেন ?' "

ভাল ভাল মাগুলো ছেড়ে দিয়ে গেল।

কোনও থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ, জনৈক অভিনেত্রীর প্রতি সুনজরে চাহিয়া আসিতেছিলেন। একদিন শুনিলেন, উক্ত থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেতাও তাহার উপর শুভ-দৃষ্টি রাখিতেছেন। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে তক্কে তক্কে ফিরিয়া থাকেন।

একদিন এমন একখানি নাটকের অভিনয় হইবে, যাহাতে উক্ত অভিনেতাকে অভিনয়কালীন সেই অভিনেত্রীকে বহুবার মাতৃ সম্বোধন

করিতে হইবে। তিনি সন্দেহ মোচনের অন্য একটা সুযোগ বুঝিয়া, অভিনয় আরম্ভ হইলে উক্ত নাটকের আর এক কপি লইয়া প্রম্পটারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে যে দৃশ্যে উভয়ে একত্রে অভিনয় করে, —সেই সেই দৃশ্যগুলি ঠিক বলিয়া যাইতেছে কিনা, মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন, উক্ত অভিনেতা যে যে স্থলে মাতৃসম্বোধন আছে, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলেন, তখন তিনি বিশেষ কুপিত ও উত্তেজিত হইয়া নটগুরু গিরিশবাবু যে-ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"গিরিশবাবু, গিরিশবাবু, ম--বাবু সব ভাল ভাল মা-গুলো ছেড়ে দিয়ে গেল। 'আপনি এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন।" গিরিশবাবু ও অন্যান্য যাঁহারা সে-ঘরে ছিলেন, ব্যবস্থা করিবেন কি—সকলে হাসিয়াই অস্থির।

নটের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' নামক একখানি নাটক অভিনীত হয়। এই তাঁহার প্রথম নাটক রচনা। বরোদার মহারাজা মলহররাও গাইকোয়াড় তৎস্থানস্থ রেসিডেণ্টকে খাদ্যের সহিত হীরকচূর্ণ প্রদানে হত্যাচেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা লইয়াই নাটকখানি রচিত। এই নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ী দেখান হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তিনি সে সময়ে কলিকাতার পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে কার্য্য করিতেন। তিনিই

এই রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পাছে অন্য কোন অভিনেতা চালাইতে গিয়া অকৃতকার্য হয়, এই জন্য তিনি স্বয়ং ড্রাইভার সাজিয়া গাড়ী চালাইতেন। তাঁহার কৃতিত্বে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল।

একরাত্রি 'হীরকচূর্ণ' অভিনয় হইতেছে। যৎকালে রেলগাড়ী ধূম উদগীরণ ও ঘন ঘন বংশীধ্বনি করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, নাট্যামোদীগণ দেখিলেন,—যোগেনবাবু ড্রাইভার সাজিয়া রেলগাড়ী চালাইতেছেন, সবুজ নিশান হাতে স্বয়ং গ্রন্থকার অমৃতলাল-বাবু গার্ড সাজিয়া গাড়ীর পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু গাইকোয়াড় সাজিয়া গাড়ীর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন,—রঙ্গমঞ্চে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণ পরম আনন্দে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে হঠাৎ সেদিন কেমন কল খারাপ হইয়া গাড়ী চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া গেল। যোগেনবাবু নানারূপ কৌশল করিয়াও যখন সুবিধা করিতে পারিতেছেন না,—সহসা রসভঙ্গে [illegible] গণ-মধ্যে যখন একটা বিদ্রূপসূচক হাস্য-ধ্বনি উঠিবার উপক্রম হ[illegible]ছে, এমন সময়ে অমৃতলালবাবুর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটী উপস্থিত বুদ্ধি জোগাইল,—তিনি তৎক্ষণাৎ বিপদ ঘটনার সাংকেতিক নিদর্শন-স্বরূপ লাল নিশান ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ অমৃতলালবাবুর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ঝুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর !

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যে-সময়ে কবিবর হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' মহাকাব্য নাটকাকারে গঠিত হইয়া অভিনীত হয়,—সে-সময়ে যোগেন-বাবু তাঁহার আর একবার ইঞ্জিনিয়ারিং মাথা খাটাইয়া ছিলেন,—কিন্তু অন্যের অসাবধানতায় তাহা শেষে দৈব-দুর্ঘটনায় পরিণত হয়।

'বৃত্র-সংহারে' বর্ণিত হইয়াছে,—স্বর্গ-বিতাড়িতা শচীদেবী যে-সময়ে নৈমিষারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সে-সময়ে দানবরাজ বৃত্রের আদেশে তৎপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি শচীপুত্র জয়ন্তকে পরাস্ত করিয়া এই হীনকার্য্য নিজে না করিয়া, তাঁহার অনুচর নিকবন্ধ নামক এক হৃদয়-হীন দৈত্যকে আদেশ করেন। নিকবন্ধ শূন্য হইতে আসিয়া শচীর কেশা-কর্ষণ পূর্ব্বক গগনপথে লইয়া যায়।

এই দৃশ্যটী দর্শকগণ-সম্মুখে প্রস্ফুটিত করিয়া দেখাইবার জন্য যোগেনবাবুর উপর ভারার্পিত হয়। যোগেনবাবু কল-কব্জা ঠিক করিয়া লইয়া, কার্য্য-সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত স্বয়ং নিকবন্ধ দৈত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কাদম্বিনী নাম্নী গ্রেট ন্যাসান্যালের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শচীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বাঁধিয়া দুইটী কড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন, এবং আপনার পায়ে ও কোমরে হুক আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। কাদম্বিনীকে উপদেশ দিয়া-ছিলেন, "যখন আমি উপর হইতে নামিয়া আসিব, তখন তুমি অভিনয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতার সহিত কড়াগুলি লাগাইয়া লইবে।"

যে-সময়ে পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অভিনয় হইতেছে, রুদ্রপীড়ের সহিত ভীষণ সংগ্রামে আহত ও ভূপাতিত জয়ন্তকে দেখিয়া শচীদেবী "কোথায় জয়ন্ত হায়!" ইত্যাদি বলিয়া সকরুণ বিলাপ করিতেছেন, দর্শকগণ আর্দ্র নয়নে মুগ্ধ হইয়া এই মর্ম্মভেদী অভিনয় দেখিতেছেন, এমন সময়ে নিকবন্ধ দৈত্য-বেশী যোগেনবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সহসা সবলে শচীর কেশাকর্ষণ করিলেন। সহসা শূন্যপথে দৈত্যকে নামিতে দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু যখন দৈত্য আসিয়া নির্ম্মমভাবে শচীদেবীর কেশাকর্ষণ করিল, —তখন ঘৃণায় ও ক্রোধে দর্শকগণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—রঙ্গালয়ে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দর্শকগণের এই প্রবল উত্তেজনা—নাট্য-সংঘর্ষণের এই অদ্ভুত উদ্দীপনা দর্শনে শচী-বেশধারিণী কাদম্বিনীও এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার আর হুকে কড়া লাগাইবার কথা একেবারেই স্মরণ নাই।

এদিকে যোগেনবাবুর সংকেতে কল চলিতে আরম্ভ হইল। শচী-দেবীর কেশ আকর্ষণ করিয়া দৈত্য উপরে উঠিতেছে। যখন চুলে বিলক্ষণ টান পড়িতে লাগিল,—তখন কাদম্বিনীর চৈতন্য হইল—সে তো হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই! আবার যোগেনবাবুও যখন কাদম্বিনীর সমস্ত দেহ-ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন—কাদম্বিনী হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই, কেবলমাত্র সে তাঁহার মুষ্ঠি-নিবদ্ধ কেশাকর্ষণে ঝুলিতেছে,—তখন তিনি ব্যস্ত ও ভীত হইয়া প্রাণ-পণে তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া রহিলেন। বিষম আকর্ষণে ও উত্তরোত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়ায় শূন্যপথে ঝুলিতে ঝুলিতে কাদম্বিনী উচ্চৈঃস্বরে পরিত্রাহি চিৎকার আরম্ভ করিল! এদিকে কাব্যামোদী-দর্শকগণ

হেমবাবুর 'বৃত্র-সংহার' কাব্যে বর্ণিত—

"দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা,
ছলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর !"

প্রত্যক্ষ মিলাইয়া পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সমবেত দর্শকমণ্ডলী শচীর প্রাণপণ আর্ত্তনাদ—জীবন্ত অভিনয় জ্ঞান করিয়া নিদারুণ উল্লাস ও বিষম করতালি-ধ্বনিতে রঙ্গালয়ের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই হরণ-দৃশ্যেই অঙ্কের শেষ। ড্রপ পড়িবামাত্র সকলে ছুটিয়া গিয়া দোদুল্যমানা কাদম্বিনীকে ধরিয়া নামাইয়া ফেলিলেন।

'ম' কত ছড়িয়েছি দেখ না।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র, নাট্যরথী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি যুবকবৃন্দ মিলিত হইয়া ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) বাগবাজারে একটি অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় সংগঠিত করেন। এই দল ভাঙ্গিয়া পরে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের পত্তন হয় এবং তাহাতে 'সধবার একাদশী'র প্রথমাভিনয় হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক এই যাত্রার দলে অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। যাত্রা-উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা প্রিয়মাধব বসুমল্লিক মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কিন্তু তাঁহার সময়াভাব-

বশতঃই হউক বা কতকগুলি অপরিচিত যুবক দেখিয়া অগ্রাহ্যবশতঃই হউক, বহু যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একখানিও গীত না-পাওয়ায়, গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া তাহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন,—"এত কষ্ট কেন ? 'একটা ভোসের লাগি কি জান খোয়াির ?' আয়, আমরা দুজনে যেমন পারি গান বাঁধি।" উভয়ে উৎসাহের সহিত উক্ত যাত্রার গান রচনা করিলেন। গিরিশবাবুর রচনা-শক্তির সহিত সাধারণের এই প্রথম পরিচয়। একখানি গীতের নমুনা,—দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতির উক্তি :

('সখি, ধর ধর'—সুরে গেয়)

আহা—মরি মরি !
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী
ছলনা বুঝি করে বনদেবী !
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢলঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী।
ইত্যাদি।

গানখানি রচনা করিয়া গিরিশবাবু যখন সম্প্রদায়কে শুনাইলেন, তখন তাঁহারা মহাখুশী হইয়া বলিলেন,—"গান বড়ই মধুর হইয়াছে।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মধুর হবে না ?—যে 'ম' অক্ষর 'মধুর' গোড়ায়,—সেই 'ম' এতে কত ছড়িয়েছি দেখনা !"

দুধটুকু বুঝি বেড়ালে সব খেয়ে গেল !

মিনার্ভা থিয়েটারে একদা গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটকের অভিনয় হইতেছে, আফিংখোর করুণচাঁদ—বেশী রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর ভজনরামের সহিত অভিনয় করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বিড়াল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বেগে প্রস্থান করিল। হঠাৎ এই দৃশ্যে দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ অভিনয়-ছলে অর্দ্ধেন্দুবাবু ভজনরাম—বেশী খ্যাতনামা অভিনেতা বিনোদবিহারী সোম (পদ-বাবু) কে বলিলেন,—"ওরে ভজন, বুঝি সর্ব্বনাশ হ'লো-একে আমি আফিংখোর মানুষ—দুধটুকু বুঝি হতভাগা বেড়ালে সব খেয়ে গেল !" রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গের উপর হাসির বন্যা ছুটিল।

এত চূণ পায়ে মেখে নষ্ট ?

ভুবনমোহনবাবুর গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় হরলাল রায় প্রণীত 'হেমলতা' নাটক অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক সত্যসখার ভূমিকা দেশবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয় বিশেষ যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর একদিন উক্ত ভূমিকা অভিনয় করিয়া বড়ই রঙ্গ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে সত্যসখা পাগলের ছদ্মবেশে কারাগারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক চিতোরাধিপতি বিক্রমসিংহকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া দেন, সে সময়ে সত্যসখার কপট উন্মাদাবস্থা

গ্রন্থকার এইরূপ ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন :—সত্যসখা যেন আকাশে মিস্ত্রী খাটাইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতেছেন। মিস্ত্রীদিগের উদ্দেশ্যে পাগলামির ঝোঁকে কখনও বলিতেছেন,—"খাট্ খাট্—বক্‌সিস পাবি, আকাশে বাড়ী—রাজা বেটারও নাই, মন্ত্রী বেটারও নাই ; কাজ কর, কাজ কর, দেখি কেমন কাজ করিস।" আবার কখনো ক্রোধের ভান করিয়া বলিতেছেন,—"মার বেটাকে মার—বেদম মার, এত চূণ গায়ে মেখে নষ্ট ?" ইত্যাদি।

অর্দ্ধেন্দুবাবু উপরোক্ত "এত চূণ গায়ে মেখে নষ্ট ?" বলিবার সময়ে চাহিয়া দেখেন, থিয়েটারের ভিতরে উইংসের পার্শ্বে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট বন্ধু সাদা মোজা পায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চের উপর হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া তাঁহার পায়ে সাদা মোজা দেখাইয়া বলিলেন,—"এত চূণ পায়ে মেখে নষ্ট ?" দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকটী মহা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

উইংসের পার্শ্বে দাঁড়াইলে অভিনেতৃগণের রঙ্গমঞ্চে গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হয়, সেজন্য তাঁহাকে বহুবার ও বহুদিন দর্শকগণের আসনে বসিয়া অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করা হইত, কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু আজি এই সুযোগ পাইয়া রসচ্ছলে তাঁহাকে একটু শিক্ষা দান করেন।

মলুম, আবার কতবার মর্‌বো !

প্রতাপচাঁদ জহুরী মহাশয়ের ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন দীনবন্ধু-বাবুর 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় হইতেছে।—

উক্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে যে-সময়ে উন্মাদিনী সাবিত্রী, কনিষ্ঠা বধূ সরলতার গলায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন, সে-সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধব আসিয়া ব্যস্ত-ভাবে "ওমা! ওকি!—আমার সরলতাকে মেরে ফেল্লে!" বলিয়া সরলতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া—"আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন" বলিয়া রোদন করিতে থাকেন।

ন্যাসান্যালে সেদিন যিনি বিন্দুমাধবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা এবং সর্দ্দির প্রাবল্যে—যখন তিনি সরলতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া রোদনাভিনয় করিতেছিলেন—তখন তাঁহার নয়ন ও নাসিকা যুগল হইতে নিঃসৃত প্রবল জলধারায় সরলতা-বেশী গোলাপসুন্দরী ওরফে সুকুমারী দত্তের মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইতে থাকায়, তিনি মহা বিরক্ত হইয়া নড়িয়া উঠিলেন। মৃতাকে নড়িতে দেখিয়া দর্শকগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। যিনি বিন্দুমাধবের ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সরলতার এই দোষটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, এখনো জীবন আছে—এখনও মরে নাই।" এই বলিয়া যখন মস্তক নত করিয়া-সরলতার মুখের নিকট পরীক্ষার ছলে ঝুঁকিয়া পড়িলেন—তখন সর্ব্বাঙ্গ শ্লেষ্মা-সলিল-ভাসিতা গোলাপসুন্দরীর ধৈর্য্যের বন্ধন একেবারেই শিথিল হইয়া যাইল,—তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে মলুম, আবার কতবার মর্‌বো?"

উক্ত প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' নাটক অভিনয় হইতেছে। যে-সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর আদেশ স্থাপনপূর্ব্বক সীতাদেবীকে বনবাস দিয়া আসিয়া উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলেন :—

"শুন শুন উন্মাদ সঙ্গীত,
চল রাম-পদে লইব আশ্রয়,
নহে জীবন সংশয় মম,—
নাদে ধ্বনি বজ্রনাদ জিনি!"

সে-সময়ে অযোধ্যা হইতে প্রত্যাগত দূত আসিয়া বলিয়া থাকে,—

"দেব! প্রমাদ পড়েছে বড়,
রঘুবীর অধীর হৃদয়,
শূন্য মন শূন্য দৃষ্টি—
শূন্য করি অযোধ্যা নগরী
সমাগত সরযূ-পুলিনে,—
ক্ষণে অচেতন, চেতন বা ক্ষণে,
আঁখি বারিধারা
মিশায় সরযূ-নীরে,
উষ্ণ শ্বাস মিশায় সমীরে!
মহর্ষি বশিষ্ঠ সাথে—
প্রবোধিতে নারেন রাঘবে।"

হাস্য-রস-রসিক স্বর্গীয় বিহারীলাল বসু (যিনি জ্যেঠাবিহারী নামে সুপরিচিত) উক্ত দূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চে

প্রবেশ করিয়া সেদিন কেমন করিয়া তাঁহার সব গুলাইয়া যাইল। "দেব! প্রমাদ পড়েছে বড়"—ধর্‌তা লাইন ধরিতে না পারিয়া, বড়ই প্রমাদে পড়িলেন। অবশেষে কাজ চালানো গোছ যাহাই হউক কিছু একটা বলিতে হইবে স্থির করিয়া লইয়া, মস্তক অবনত-এবং উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া, লক্ষ্মণ-বেশী স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুকে আহ্বান-সূচক ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন,—"আসুন, আসুন! শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর—"

রঙ্গালয়ে কিরূপ হাস্যের রোল উঠিল, পাঠকগণই তাহা অনুমান করুন।

মেজ্‌দাদা আমায় পারে না কি ?

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নামক একখানি করুণ-রসাশ্রিত নাটক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের শেষভাগে রাজ-কুমার নন্দ ও মন্ত্রী শকটার পুত্র বিজয়বল্লভের পরস্পর অসিযুদ্ধ হয়, এবং নন্দ আহত হইয়া ভূপতিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। নগেন্দ্রবাবু মধ্যম এবং কিরণ-বাবু কনিষ্ঠ। কিরণবাবু তলোয়ার-খেলা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নাটকে নগেন্দ্রবাবু বিজয়বল্লভের এবং কিরণবাবু নন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দৃশ্যে যে-সময়ে বিজয়বল্লভ-বেশী নগেন্দ্রবাবু এবং নন্দ-বেশী কিরণবাবুর পরস্পর অসিযুদ্ধ হইতেছে, সে-সময়ে কিরণবাবু এরূপ ক্ষাত্র-তেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, যদিও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার ভূপতিত হইবার কথা, কিন্তু পতন তো দূরের কথা, তাঁহার অসি-সঞ্চালন—নৈপুণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দর্শকগণ সমর-কুশলী বীরদ্বয়ের অসিযুদ্ধ দর্শনে পরমানন্দে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন এই ভীষণ সমরের কোনরূপ অবসানের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন থিয়েটারের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ উইংসের পার্শ্ব হইতে অনুচ্চস্বরে কিরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পড় কিরণ পড়, বড় দেরী হয়ে যাচ্চে।"

কিরণবাবু যুদ্ধ করিতে করিতেই বলিলেন,—"তলোয়ার খেলায় মেজদাদা আমায় পারে না কি?"

ক্রমে যুদ্ধের অবস্থা যখন সঙিন হইয়া আসিল, তখন নগেন্দ্রবাবুই যুদ্ধ করিতে করিতে জনান্তিকে বলিয়া উঠিলেন,—"আমিই হার মান্‌চি ভাই, তুই পড়।" কিরণবাবু তখন বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

এই—আমার নন্দাই।

সলোমন নামক জনৈক প্রবীণ নাট্যামোদী ইহুদী সাহেব একটি ফুলের বাস্‌কেট সঙ্গে লইয়া বহুকাল ধরিয়া থিয়েটার দেখিতে আসিতেন। ইনি বাঙ্গালা বেশ বুঝিতেন এবং বাঙ্গালা থিয়েটারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখস্থ দর্শকের আসনে ইনি উপবেশন

করিতেন এবং যে-সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের অভিনয় দর্শনে আনন্দলাভ করিতেন, বাস্‌কেট হইতে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া বাহির করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার নাট্যানুরাগ এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহার উপহার সমাদরে গ্রহণ করিতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটার দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সলোমন সাহেবকে বুঝিতে পারিবেন।

নগেন্দ্রবাবুর মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন 'নবীন তপস্বিনী' নাটক অভিনয় হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু জলধর সাজিয়াছেন এবং জলধর-পত্নী জগদম্বা সাজিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধা রঙ্গরসিকা অভিনেত্রী পরলোক-গতা গুলফন্ হরি। —যেমন দেবা—তেমনি দেবী!

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে যে-সময় স্বামী-চরিত্রে সন্দিগ্ধা জগদম্বা-বেশিণী গুলফন্ হরি, মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া, "আজ তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন,...আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ ক'রে বসি, যদি ধর্ত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে 'মা' বলিয়ে নেব, তবে ছাড়বো।" ইত্যাদি বলিয়া যখন স্বামী আগমন-প্রতীক্ষায় ঘোমটা দিয়া বসিতে যাইতেছেন,— উপরোক্ত সলোমন সাহেব পরম কৌতূহলা-ক্রান্ত এবং অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গুলফনের উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে একছড়া গ'ড়ে মালা ছুড়িয়া দিলেন। গুলফন্ হরি সম্মানের সহিত মালা গ্রহণ করিলেন এবং তাহা গলায় পড়িয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর জলধর-বেশী হাস্য-মহার্ণব অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া, জগদম্বার হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হইলেন তাহা সকলেই জানেন।

যে-সময়ে জগদম্বা মাথায় ঘোমটা খোলেন, এবং তাঁহার গলার মালা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, তখন জলধর-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু অভিনয়-ছলে বলিলেন,—"আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো, বলি এই যে গলায় বাহারের মালা দুল্‌ছে,—মালাটি দোলালে কে, বল দিলে কে?" গুলফন্ হরি তৎক্ষণাৎ অভিনয়-ছলে রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখস্থ দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সলোমন সাহেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই, আমার নন্দাই।"

দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং অর্দ্ধেন্দুবাবু উপযুক্ত Co-actress-এর পরিচয় পাইয়া গুলফন্ হরির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরু হ'লে খুঁজে পেতে।

এমারেল্ড থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু, সুবিখ্যাত গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র, খ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গীয় কুমুদবিহারী সরকার, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, উক্ত থিয়েটারের ষ্টেজ-ম্যানেজার কাশীনাথ বসু প্রভৃতি একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—এমন সময় সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর তথায় উপস্থিত হইয়া অতুলবাবুকে বলিলেন,—"কি হে—তুমি এখানে?—আমি সমস্ত দিন তোমাকে গরু খোঁজা করে বেড়িয়েছি।" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"গরু হ'লে খুঁজে পেতে, গরু তো নয়, তাই খুঁজে পাও নাই।"

মেয়েদের লইয়া যাঁহারা থিয়েটার দেখিতে আসেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার পর স্ত্রী-লোকদের বাহির হইবার পথে কিরূপ গাড়ীর ভিড় হয় এবং পূর্ব্ব হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে স্ত্রীলোকদের লইয়া বাটী যাইতে কত বিলম্ব হয়।

তালতলা নিবাসী জনৈক ভুক্তভোগী ভদ্রলোক একদিন বাটীর মেয়েদের এইরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া থিয়েটার দেখাইতে লইয়া আসিয়াছেন, যে, থিয়েটার ভাঙ্গিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে তিনি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইবেন, তাঁহারাও সর্ব্ব-শেষ অভিনয়টুকু দেখিবার লোভ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবেন। বাবুটি এককথার মানুষ এবং কিঞ্চিৎ রুক্ষ প্রকৃতির—তাহা বাটীর স্ত্রীলোকদের অবিদিত ছিল না। যাহাই হোক তাঁহারা 'প্রফুল্ল' নাটক তো সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন—'প্রাণের টান না হয় শেষটুকু নাই দেখিবেন,"—এই বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিয়া মনো-মোহন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন।

অভিনয় শেষ হইবার ঠিক দশ মিনিট পূর্ব্বে বাবুটি স্ত্রীলোকদের বহির্গমন পথে গাড়ী খাড়া করিয়া ঝিকে দিয়া বাটীর মেয়েদের সংবাদ দিয়াছেন, সংবাদ পাইবামাত্র মেয়েরা বাবুর রোষ-কষায়িত মূর্ত্তি, চক্ষের সম্মুখে যেন দেখিতে পাইলেন এবং মিলন দৃশ্য দেখিবার মায়া পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বাবুটী মেয়েদের সত্যরক্ষা ও আজ্ঞা-পালনের সৎ-দৃষ্টান্তে প্রীত হইয়া গাড়ীর ভিড় হইতে না হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

যখন থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইল এবং দলে দলে স্ত্রী লোকেরা নিম্নে নামিয়া আসিলেন,—তখন উপরে একটা করুণ কোলাহল শোনা গেল। ব্যাপার কি—উপরে এত গোলমাল কিসের? থিয়েটারের ঝি নীচে নামিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"ওঁদের ছেলে ঘুমুচ্ছিল, থিয়েটার ভাঙ্গবার পর ছেলে তুলে দেখেন, তাঁদের ছেলে নয়। দেখ্‌তে তেমনি নাদুস-নুদুস গোরাপানা বটে, কিন্তু গলায় তো এদের ছেলের মাদুলি ছিল না, আর কারো ছেলে হবে। কিন্তু, বাবু, উপরে তো আর কোন ছেলে নাই।"

একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল—শিশুহারা স্ত্রীলোকেরা নীচে নামিয়া আসিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। যে দুইটী বাবু মেয়েদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারাও খানিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে মেয়েদের সহিত যোগদান করিলেন। থিয়েটারের দারোয়ান অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে দেখিয়া, উক্ত থিয়েটারের সুযোগ্য বিজিনেস্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়কে গিয়া খবর দিলেন। চারুবাবু ছুটিয়া আসিলেন এবং সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ভদ্রলোক দুইটীকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আপনারা অত অধীর হ'চ্চেন কেন? মেয়েদের কাঁদতে বারণ করুন। ছেলে যে বদল হ'য়েছে, তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে। আপনারা পরের ছেলে দেখে যেমন অস্থির হয়ে উঠেছেন—আর যাঁরা আপনাদের ছেলে নিয়ে গেছেন—তাঁরাও বাড়ী গিয়ে যখন দেখ্‌বেন, তাঁদের ছেলে নয়, তখন কি তাঁরাই আর স্থির থাক্‌বেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, তাঁরা এলেন বলে।"

দেখিতে দেখিতে কোলাহলপূর্ণ রঙ্গালয় জনশূন্য হইয়া গেল—আলোকমালা-বিভূষিত রঙ্গালয়ের প্রায় সকল আলোই নির্ব্বাপিত

হইল, রঙ্গালয় নীরব নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিল। জাগিয়া বসিয়া রহিলেন শুধু কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত থিয়েটারের বিজিনেস ম্যানেজার, দারোয়ান ও ঝি-গণ এবং ব্যাকুল-হৃদয়ে সপরিবারে ভদ্রলোক তুইটী।

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে সেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, একখানি ছ্যাকড়া গাড়ীর দ্রুত আগমন শব্দ পাওয়া গেল এবং 'চালাও চালাও' বলিয়া উৎকণ্ঠিত মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল। স্ত্রী লোকেরা এবং ভদ্রলোক তুইটীও সেই শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলেন। চারুবাবু বলিলেন,—"ব্যস্ত হবেন না, আপনাদেরই ছেলে আসছে।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানি থিয়েটারের ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতর হইতে জনৈক ভদ্রলোক লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সম্মুখে চারুবাবুকে দেখিতে পাইয়া "মশায়, মশায়" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। চারুবাবু বলিলেন,—"আপনি স্থির হ'ন, স্থির হ'ন—ছেলে পাবেন, ছেলে বদল হয়েছে মাত্র। কই সে ছেলে কই?" দেখিতে দেখিতে গাড়ী হইতে আর একটি ভদ্রলোক ছেলে-কোলে বাহির হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্র-লোক তুইটী ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া "হ্যাঁ, এই আমাদের ছেলে" বলিয়া আগ্রহের সহিত শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তালতলার ভদ্রলোকও তাঁহাদের ছেলে চিনিতে পারিয়া পরমাগ্রহে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

সকলের বুক হইতে তখন পাষাণের চাপ সরিয়া গিয়া সহজ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। অভিনয় দেখিতে আসিয়া এই তুই দল একখানি বাস্তব প্রহসন অভিনয় করিয়া গেলেন।

"হুশ"

সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব মহাশয় যে-সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার লিজ লইয়া গ্রাণ্ড ন্যাসান্যাল থিয়েটার নামে তথায় অভিনয় করিতেছিলেন,—সে-সময়ে একদিন কোনও ভদ্র পরিবার উক্ত থিয়েটার দেখিতে আসিয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহাদের একটি শিশু-পুত্র ফেলিয়া যান। থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ঝিয়েরা স্ত্রী লোকদের বসিবার স্থানগুলি ভালো করিয়া দেখিয়া পরে আলো নিভাইয়া দেয়। যদ্যপি কেহ অলঙ্কারাদি ফেলিয়া যান, তাহা থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট জমা দিতে হয়; সন্তোষজনক প্রমাণ লইয়া প্রকৃত অধিকারীকে হারানো জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সেই নিয়মানুযায়ী থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর যখন ঝি স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানগুলি ভালো করিয়া দেখিতেছিল, সে-সময়ে দেখে—একটি শিশু একপার্শ্বে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সে-সময়ে অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বা যাইতেছেন, চুনিবাবুও বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময়ে ঝি উক্ত শিশুটিকে কোলে করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিশুটির অসহায়-অবস্থার কথা প্রকাশ করিল। সহসা নিদ্রা ভঙ্গে ও আপনার লোক কাহাকেও না দেখিয়া শিশুটি তখন কাঁদিতেছিল।

চুনিবাবু প্রভৃতি যাঁহারা সে-সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শিশুটিকে আদর করিয়া কোলে লইয়া খাবার খাওয়াই—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খোকা তোমার নাম কি?" খোকা সন্দেশ খাইয়া একটু ঠাণ্ডা—

হইয়া বলিল—"হাব্‌বু।" ছেলেটির নাম হাবু জানা গেল। তাহার পর চুনিবাবু আবার আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় থাক বাবা—তোমার বাড়ী কোথায় ?" শিশুটি হাত নাড়িয়া অঙ্গুলী সংকেত করিয়া বলিল—"হুশ"। খোকার কথায় সকলে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর নানা প্রকারে ও নানা কৌশলে বহু প্রশ্ন করিয়া খোকার বাড়ীর সন্ধান লইবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল ; কিন্তু খোকার মুখে একমাত্র 'হুশ' ছাড়া আর কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ইহারা স্থির করিলেন, অবশ্যই খোকার সন্ধানে শীঘ্রই বাটী হইতে কেহ না কেহ আসিবেই,—অপেক্ষা করাই যুক্তি-সঙ্গত। কেহ কেহ বাটী যাইলেন, কেহ কেহ বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চুনিবাবুর সহিত বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জনৈক ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পড়িলেন। থিয়েটারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে চুনিবাবু প্রভৃতি খোকাকে লইয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন, লোকটি আসিয়াই খোকাকে দেখিতে পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। চুনিবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনাদের বাড়ীর মেয়েরা এত বেঁহুশ।" ভদ্রলোকটি স্ত্রী লোকদের উদ্দেশ্যে নানারূপ তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন,—"আর বলেন কেন ম'শায়, যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে,—'আমি মনে করেছিলুম, পিসীমা নিয়েছে' ইত্যাদি।"

চুনিবাবু বলিলেন,—"ম'শায়, খোকাকে যতবারই জিজ্ঞাসা করলুম—খোকা, তোমার বাড়ী কোথায় ? খোকা ততবারই হাত নাড়িয়া অঙ্গুলী-সংকেতে বলে—'হুশ'। রহস্যটা কি বলুন দেখি ?" ভদ্রলোকটী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ম'শায়, আমাদের বাড়ী বাদুড়বাগানে

আপার সারকিউলার রোডের উপর। বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে মিউনিসি-প্যালিটীর স্ক্যাভেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত করে। খোকা কথা ফোট্‌বার পর হতেই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুশ হুশ শব্দ করে ইঞ্জিন আস্‌তে দেখলেই হাত তুলে বল্‌তো—'হুশ'! সে অভ্যাসটি এখনও আছে।" তখন সকলে 'হুশ' শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

HISTORICAL DRAMA বন্ধ হ'য়ে গেল।

'রাজস্থান' অবলম্বনে ইদানীং অধিকাংশ নাট্যকারেরা নিজ নিজ খেয়াল-অনুসারে রাজপুত রাজাগণের কিরূপ সব অদ্ভুত চরিত্র অঙ্কিত করেন,—তাহা ইতিহাসজ্ঞগণের অবিদিত নাই। নাট্যাচার্য্য অমৃত-লালবাবু এ নিমিত্ত ঐতিহাসিক নাটকের নাম শুনিলেই রাগিয়া উঠেন।

নাট্যরথী ও কবি—নাট্যকার স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, যে-সময়ে লিজ লইয়া ষ্টার থিয়েটার পরিচালনা করিতেছিলেন, সে-সময়ে একদিন অমৃতলালবাবু উক্ত থিয়েটারে আসিয়াই বলিলেন,—"আঃ বাঁচা গেল—Historical drama বন্ধ হ'য়ে গেল।"—সহসা এ-সংবাদে সকলে চমকিত হইয়া বলিলেন,—"সেকি ম'শায়!" অমৃতলালবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"রাজপুতানার রাজগণকে লইয়া আধুনিক নাট্যকারেরা 'নকড়—ছকড়া' করে, এজন্য পশ্চিমের রাজারা সব একত্র হ'য়ে লাট সাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন,—তাঁদের পূর্ব-পুরুষগণকে নিয়ে থিয়েটারওয়ালারা যথেচ্ছাচার করে,

—এ সম্বন্ধে সুবিচার করা হ'ক। লাট সাহেব তাঁদের দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রেছেন। Historical drama আর হবে না।"

অমরবাবু প্রভৃতি সকলে যখন অমৃতবাবুর এই গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে গুপ্ত শ্লেষ উদ্ভাবনে সমর্থ হইলেন. তখন সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন।

যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া অজ্ঞতা।

মনোমোহন থিয়েটারে একটী যুবক প্রায় বৎসরাবধি শিক্ষানিবিশী করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে প্রায়ই বলিয়া থাকে,—"মহাশয়, এবার আমার মাহিনা করিয়া দিন, আর কতদিন apprentice থাক্‌বো?" কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বলেন,—"আগে যোগ্যতা দেখাও, তবে তো মাহিনা হবে।" যুবকটির অভিনয় যোগ্যতা একেবারেই ছিল না, অথচ কেমন করিয়া সে অভিনয়-যোগ্যতা দেখাইবে, সদাসর্ব্বদা তাহাই ভাবিত।

একদিন উক্ত থিয়েটারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী' নাটকে পঞ্চমাঙ্কের সর্ব্বশেষ দৃশ্য অভিনয় হইতেছে। এই দৃশ্যে সম্রাট আলাউদ্দীন "রক্ত চাই—রক্ত চাই" করিয়া দেবলা-দেবীকে আক্রমণ করিতে যাইলে এবারে বলদেব তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলে, আলাউদ্দীন "কে আছিস—বন্দী কর, রক্ষী—রক্ষী—" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। নাটকে কিন্তু রক্ষীগণের প্রবেশ নাই। কাফুর সে সময়ে একা সবেগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলে,—"আর রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমার পাপ-রাজত্বের যবনিকা আজ এইখানেই পড়বে।"

যখন আলাউদ্দীন রঙ্গমঞ্চ হইতে "রক্ষী—রক্ষী" বলিয়া ডাকিতেছে, তখন উক্ত যুবকটী রঙ্গালয়ের ভিতরে উইংসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল সে ভাবিল, রঙ্গমঞ্চ হইতে "রক্ষী—রক্ষী" বলিয়া চিৎকার করিতেছে কিন্তু কোনও রক্ষীকে দেখিতেছি না। বোধহয়, তাহারা সাজিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমার তো যোগ্যতা দেখাইবার এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত। যুবকটী আত্মহারা হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ড্রেস-ঘরে ছুটিয়া গেল এবং একখানি তরবারি-হস্তে বাহির হইয়া "জাঁহাপনা" বলিয়া একলম্ফে রঙ্গমঞ্চে গিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে কাফুর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপশ্চাতে ধুতি জামা-পরিহিত অথচ তরবারি হস্তে একজনকে খামকা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যবনিকা পতিত হইলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের গঞ্জনা ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনায় ক্রমে যুবকটী বুঝিতে পারিল, যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া কিরূপ সে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। তৎপর দিবস হইতে আর তাহাকে থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

"তেল—গামছা—জলখাবার !"

যে-সময়ে সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া অভিনয় হইত, সে সময়ে একদিন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছেন, সামনে থিয়েটারের পানওয়ালা এক ছোকরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু এইবার কি প্লে শেষ হবে?" অর্দ্ধেন্দুবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"না, আবার নূতন ক'রে বসবে

লেমোনেড—পান—সিগারেট, বলে তোকে আর হাঁকতে হবে না। এইবার ভিতরে গিয়ে হাঁক, 'তেল—গামছা—জলখাবার' !"

মণি অরডার।

কোহিনূর থিয়েটারে একদিন সকাল হইয়া গিয়া রৌদ্র উঠিয়াছে, তখনও অভিনয় চলিতেছে। উক্ত থিয়েটারের জনৈক অভিনেত্রীর মাতা, কন্যার বাটী যাইতে অধিক বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিতা ও ব্যস্ত হইয়া থিয়েটারে ছুটিয়া আসিয়াছে। যখন সে থিয়েটারে পঁহুছিল, তখন সবেমাত্র থিয়েটার শেষ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী বিস্মিত হইয়া কন্যাকে বলিল,—"বাবুরা সব মণি অরডার ক'রে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, এখনো তোদের থিয়েটার হ'চ্ছে ?" প্রথমে উক্ত রমণীর কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারিলেন না, পরে যখন তাঁহার কন্যার মুখে জ্ঞাত হইলেন, তাহার মাতা 'মর্ণিং ওয়াক'কে 'মণি অরডার' বলে, তখন সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"NATURAL—NATURAL" !

গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বাক্‌চি মহাশয় যে-সময়ে সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের চিত্র প্রকাশ করেন, তিনি সেই চিত্রে মহাদেবকে দীর্ঘ জটার সহিত দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফে ভূষিত করিয়াছিলেন, মিনার্ভা থিয়েটারের জনৈক চিত্রকর (আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র) উক্ত নব-প্রকাশিত চিত্রখানি থিয়েটারে আনিয়া নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুবাবুকে

দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখুন ম'শায়, আমাদের গুরুদেব কি স্বাভাবিক (natural) মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিত্রকর মহাদেবের ছবি আঁকিয়াছেন, সকলেই মহাদেবের বড় বড় জটা ও গোঁফ দিয়াছেন, কিন্তু কেহই দাড়ি আঁকেন নাই। এটা unnatural নয় কি?"

অর্দ্ধেন্দুবাবু উক্ত যুবকের বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমরা কেউ কিছু সূক্ষ্মভাবে বোঝ না, কেবল 'natural natural' ক'রে চিৎকারে দেশটার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। বাপু, তোমার গুরুদেব তো বড় বড় দাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু মহাদেবের হস্তে বড় বড় নখ দেন নাই কেন, তা'হলে তো আরও Natural হ'ত। বিলাতি ভাবে আর্ট স্কুলের শিক্ষায় তোমাদের এই Natural ভাব দাঁড়িয়েছে। আরে আহাম্মুখ, তোরা সব কি বুঝবি, আমাদের দেবতারা সব চির-যৌবন, সেইজন্য কোন দেবতার দাড়ি নাই। পুরুষের যৌবন-লক্ষণ গোঁফের রেখায় এবং স্ত্রীলোকের যৌবনের লক্ষণ পীনোন্নত স্তনে, কেহ তলাইয়া দেখেও না—বোঝেও না, কেবল একটা পড়া বুলি শিখিয়াছে—Natural-Natural!"

আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী অবলম্বনে দীনবন্ধুবাবু 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া, লং সাহেবের এক মাস জেল এবং সহস্র মুদ্রা জরিমানা হয়। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যৎকালে

'নীলদর্পণ' অভিনীত হইতে থাকে, একদিন পুলিশের ডেপুটী কমিশনার জাইলাস সাহেব 'নীলদর্পণ' অভিনয় দেখিতে আসেন, সকলেরই আতঙ্ক হইল, বুঝিব। আজ একটা বিভ্রাট ঘটে, দু'চারজনকে আজ নিশ্চয় ধরিয়া লইয়া যাইবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর তোরাপের ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তিনি তোরাপের বেশেই আস্ফালন করিয়া বলিলেন, —"ধরে নিয়ে যায় যাবে, আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব।" যাহা হউক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আতঙ্কের সংবাদটা পুলিশ সাহেবের নিকট পঁহুছিতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"দীনবন্ধুবাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাই আমি তাঁ'র এই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন?"

হাতির শুঁড় কাটিয়া শুয়ার!

মহাকবি গিরিশচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তিনি অভিনয় করেন না বটে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির নূতনত্ব প্রদর্শনে বঙ্গ-রঙ্গালয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। চাঁদবিবি, ছত্রপতি শিবাজী, বঙ্গে বর্গী, নজরে নাকাল প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত। ইনি একজন সুরসিক।

মনোমোহন থিয়েটারে, সুপ্রসিদ্ধ 'মোগল-পাঠান' প্রণেতা শ্রীযুক্ত

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দুবীর' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রায় রাত্রি ৩টা বাজিয়া যায়। এ-নিমিত্ত মিউনিসিপ্যাল আইনানুযায়ী যাহাতে রাত্রি ১টার মধ্যে উক্ত নাটকের অভিনয় শেষ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নাটকখানি একদিন কাটিয়া-ছাঁটিয়া ছোট করিয়া লইতেছিলেন। মহাতাপবাবু সে-সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,-"আপনারা যে ছাঁটিতে ছাঁটিতে হাতির শুঁড় পর্য্যন্ত কাটিয়া ক্রমে তাহাকে একটি শুয়ারে দাঁড় করাইলেন!" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

একটা 'হুঁ' ক'র্‌লে কি একটা 'হুঁা' ক'র্‌লে।

সুবিখ্যাত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'চাঁদবিবি' নাটক লইয়া, ১৩১৪ সাল, ১৬শে শ্রাবণ কোহিনূর থিয়েটার হল প্রথম খোলা হয়। সুবিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয় যে-সময়ে কোহিনূরে যোগদান করিলেন, সে-সময়ে 'চাঁদবিবি' নাটকের উৎকৃষ্ট ভূমিকাগুলি অন্যান্য অভিনেতাগণ-মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বিজাপুরের সুলতান আদিলসার ভূমিকা প্রদান করা হয়। ভূমিকাটী ছোট এবং তাহা সাধারণ অভিনেতা কর্ত্তৃক অনায়াসে অভিনীত হইতে পারিত।

যে-সময়ে উক্ত নাটকের পোষাক প্রস্তুত হইতেছে, সে-সময়ে আদিলসার পোষাক খুব জম্‌কালো করিয়া প্রস্তুত করিবার কথা হয়, এবং ক্ষীরোদবাবু মহাতাপবাবুকে সেইরূপ উপদেশ দিতে ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"আদিলসার ভূমিকায়

অভিনয় চাতুর্য্য দেখাইবার এমন কিছু নাই, যা'তে পোষাকের একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বর প্রয়োজন হবে। যাহা হয় একটা ক'রবেন।"

গ্রন্থকার ক্ষীরোদবাবু বুঝিলেন, দানিবাবুর ভূমিকাটি মনোনীত হয় নাই। তিনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন, —"আদিলসা দাক্ষিণাত্যের একটা বড় বংশের—একটা মস্ত ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে, সে কি দিন রাত বড় বড় করে ব'ক্‌বে? জোর একটা 'হু' ক'রলে কি একটা 'হাঁ' ক'রলে।"

গুঁপো গহরজান।

গ্রাণ্ড ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'দিলবাহার' নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। হাস্যার্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত প্রহসনে জনৈক মোসাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিতেন।

বাবুর বৈঠকখানায় মহাসমারোহে বাঈজীর নাচ চলিতেছে। বাঈজীর নাচ শেষ হইবামাত্র অক্ষয়বাবু মাথায় ঘোমটা দিয়া বাঈজীর অনুকরণে অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরে ঈষৎ ঘোমটা খুলিয়া, দর্শকগণকে শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানি দেখাইয়া বলিলেন,—"এটী আপনাদের গুঁপো গহরজান।"

'দেব চালে' অভিনয়।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর মহাশয়ের মাঝে একবার খেয়াল হয়, দেবতা ও রাক্ষসের ভূমিকাভিনয় সাধারণ মানুষের ন্যায়

হওয়া উচিৎ নহে। দেবতা ও রাক্ষসের 'বোল' ও 'চাল' আলাদা করিয়া দেখাইতে হইবে।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "আদর্শ সতী' (সাবিত্রী-সত্যবান) গীতিনাট্য অভিনয় হইতেছে। মতিলালবাবু যমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন তাঁহার 'দেব চালে' অভিনয় করিবার খেয়াল হইয়াছে। গদা-স্কন্ধে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রঙ্গমঞ্চে তিনি এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন দর্শকদের ধারণা হয়—তিনি অশরীরী। দেব-কণ্ঠে কথা কহিবার চেষ্টায় এমন একটা অস্বাভাবিক সুর বাহির করিলেন যে, দর্শকগণ তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতাকে সহসা এই-রূপ অদ্ভুত অভিনয় করিতে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন, পরে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মতিলালবাবু কিন্তু দর্শকগণের হাস্য ধ্বনিতে বিচলিত না হইয়া 'দেব চালেই' অভিনয় চালাইতে লাগিলেন।

সেদিন ক-একজন সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু তাহাদের সহিত কিছুক্ষণ আপ্যায়িত করিয়া থিয়েটারের ভিতরে আসিলে, মতিলালবাবু বলিলেন,—"সাহেবেরা কে?" অমৃতবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"মার্সেল নিলের নাম শোনো নাই? মস্ত একটা পণ্ডিত, ক-একজন বন্ধু সঙ্গে বাঙ্গালা থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছে।" মতিলালবাবু বলিলেন,—"কি বলে?" অমৃত-লালবাবু বলিলেন,—"তোমার 'দেব চালের' অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। তোমাকে একটা genious বলে শতমুখে সুখ্যাতি ক'র্‌লে।"

মতিলালবাবু অমৃতবাবুর এই সম্পূর্ণ অমূলক সংবাদ অতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"এ-দেশে Art ক'জনে বোঝে,—এক গিরিশবাবু আর তুমি !"

পরমান্নে কইমাছ ।

ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অগ্রজ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়-বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ' নাটক যে-সময়ে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে পুনরভিনীত হয়, সে-সময় কর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় করিতেন—রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর। কর্ত্তা dispeptic, ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, দিন দিন রকমারি করিয়া আহার করিতে পারিলে, একটু একটু ক্ষুধাও বাড়বে—আহারে রুচিও হবে।

একদিন অভিনয়কালে—আহারে বসিয়া, কর্ত্তা-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু গিন্নীকে বলিতেছেন,—"দিন দিন এক ঘেয়ে খাবার না ক'রে পাঁচ দিন পাঁচ রকম করতে পারো না ?" অবশ্যই একথা নাটকে নাই। গিন্নীও বানাইয়া বলিলেন,—"কি রকম ক'রবো বল ?" কর্ত্তা-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"হলো পরমান্নে একদিন একটা কই মাছ ছেড়ে দিলে।"

"ও রক্ষিত! বাজারে নয়?"

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টার থিয়েটারের জনৈক কর্ম্মচারীকে কয়েক জোড়া কাপড় কিনিতে দিয়াছিলেন। রিহারস্যাল হইতেছে, এমন সময়ে সেই কর্ম্মচারী বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিয়া উপস্থিত। কয়েকটি অভিনেতা বস্ত্র দেখিয়া ও তাহার দর শুনিয়া বলিলেন,—"দাম কিছু বেশী পড়েছে।" অমৃতবাবু উক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ দোকান থেকে কিনে আনলে?" কর্ম্মচারী বলিল,—"আজ্ঞে, রক্ষিত কোম্পানীর দোকান থেকে।" অমৃতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"ও রক্ষিত! বাজারে নয়? তাহলে মাল ভাল, দামটাও বেশী হবে বই কি।"

ধূমে ধূমাকার!

বাগবাজারে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (তিনকড়িবাবু) মহাশয়ের 'অভিমন্যু বধ' সখের যাত্রা, এক সময় কলিকাতায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বহু শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির আলয়ে বহু দিন ধরিয়া মহাসমারোহে ইহার অভিনয় হইয়াছে। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও ইহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন কোনও ধনাঢ্য-ভবনে উক্ত 'অভিমন্যু বধ' যাত্রাভিনয় হইতেছে। অভিনয় খুব জমিয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যিনি অর্জ্জুনের ভূমিকাভিনয় করিবেন, রাত্রি হইতে তাঁহার ভেদ-বমি হইতেছে, তিনি কোনও মতে আসিতে পারিবেন না। অর্জ্জুনের

অভিনয় নাটকের শেষদিকে হইলেও পুত্র-শোকাতুর পার্থের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞাভিনয়ে সুনিপুণ অভিনেতার প্রয়োজন।

কে 'অর্জ্জুনের' ভূমিকা অভিনয় করিবে, সম্প্রদায় মধ্যে মহাদুর্ভাবনা পড়িয়া গেল। নাট্যাচার্য অর্দ্ধেন্দুবাবু সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকেই ধরিয়া বসিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"আমার একবর্ণও মুখস্থ নাই, কেমন করিয়া সহসা আসরে নামিব ?" সকলে নাছোড়বান্দা—অগত্যা তাঁহাকে অর্জ্জুনের পোষাক পড়িয়া আসরে নামিতে হইল।

সংসপ্তক-যুদ্ধরত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট দূত গিয়া যখন অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ জানাইল,—অর্জ্জুন-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু বুঝিলেন, প্রম্পটার সেরূপ সুনিপুণ নহে—যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কাজ চালাইয়া দিতে পারেন। এরূপ সঙ্কটাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, যখন তিনি ভাবিতেছেন—সে-সময়ে অদূরে ভিয়ান-ঘর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সেই ধূম দেখাইয়া বলিলেন,—"সখা, পুত্রশোকে আমি সব ধূমে-ধূমাকার দেখছি। আমার আর বাক্য নিঃসরণ হ'চ্চে না।"

পুরুষ—না নারী ?

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir W. W. Hunter সাহেব জোড়াসাঁকো, সান্ন্যাল-ভবনস্থ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রায়ই তিনি বন্ধুবান্ধব সঙ্গে ন্যাসান্যালে আসিয়া টিকিট কিনিয়া অভিনয় দেখিতেন।

একদিন হাণ্টার সাহেব কয়েকটী সাহেব ও মেমের সহিত উক্ত থিয়েটারে আসিয়া দীনবন্ধুবাবুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লীলাবতীর ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন। তিনি যেরূপ রূপবান, সেইরূপ, স্ত্রীজনসুলভ মিষ্টভাষী ছিলেন—বয়সও অল্পই ছিল। তাঁহার সুললিত ভাব-ভঙ্গীসহ নিখুঁত অভিনয় দর্শনে মেমসাহেবের ধারণা হয়, কোনও উচ্চ শিক্ষিতা রমণী এই অংশ অভিনয় করিতেছেন। হাণ্টার সাহেব বলিলেন,—"এই থিয়েটারে পুরুষেরাই স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকাভিনয় করিয়া থাকে।" মেমসাহেব কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে যবনিকা পতিত হইলে হাণ্টার সাহেব উক্ত মেম-সাহেবকে রঙ্গমঞ্চের ভিতর সঙ্গে করিয়া আনিয়া ক্ষেত্রবাবুকে ডাকাইলেন। লীলাবতী-বেশী ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তখনও মেমসাহেবের সন্দেহ দূর হইল না। শেষটা যখন হাণ্টার সাহেব ক্ষেত্রবাবুর পরচুলাটি তুলিয়া ধরিলেন, তখন মেমসাহেব যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"I took him as an educated brhma lady."

বৃন্দাবনে বিনোদিনী।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে-সময়ে পশ্চিমে দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন, সে-সময়ে নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী অল্পবয়স্কা ছিলেন।

সম্প্রদায় বৃন্দাবনে পঁহুছিয়া বাসাবাড়ী ঠিক করিয়া বাজারে বাহির হইলেন। তথা হইতে সম্প্রদায়স্থ সকলের জলখাবারের নিমিত্ত প্রচুর

জলখাবার ক্রয় করিয়া আনিয়া শ্রীমতী বিনোদিনীকে বলিলেন,—"বিনোদ, তুমি ছেলেমানুষ, এইমাত্র গাড়ীতে এসে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, ভাল ক'রে জল খেয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে থাক, আমরা গোবিন্দজীউকে দর্শন ক'রে এখনি ফিরে আসছি।"

সম্প্রদায় দেব-দর্শনে বাহির হইলে বিনোদিনী বাসার দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া জল খাইলেন, পরে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একাকিনী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি বানর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। বিনোদিনী বালিকাসুলভ চঞ্চলতাবশতঃ তাহাকে একটি কাঁকুড় খাইতে দিলেন, সে খাইতেছে—এমন সময় আর দুটী বাঁদর আসিল,—বিনোদিনী তাহাদেরও খাবার দিলেন। আবার গোটা দুই আসিল, শ্রীমতী বিনোদিনী ভাবিলেন যে, ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চারি-পাঁচটী জানালা ছিল। বিনোদিনী যত আহার দিতে লাগিলেন, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন বিনোদিনী বিশেষ ভীতা হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় সমস্তই তাহাদের দিলেন; ভাবিলেন—এইবারে সকলে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, কপির সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে খাবার শেষ হইয়া গেল; দলে দলে কপিগণ খাবারের জন্য জানালা দিয়া হাত বাড়াইতে লাগিল এবং খাবার না পাইয়া কেহ কেহ বা দন্ত বাহির করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ইহার পূর্ব্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'মেঘনাদবধ' নাটকে বিনোদিনী প্রমীলা সাজিয়া বাসন্তীকে বলিতে শুনিতেন :—

"কেমনে পশিবে লঙ্কাপুরে, আজি তুমি ?
অলঙ্ঘ্য সাগর সম রাঘবীয় চমূ
বেড়িছে তাহারে !"

আজ স্বয়ং অসংখ্য কপি সম্মুখীন হওয়ায় তাঁহার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সম্প্রদায়স্থ সকলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—বাসা-বাড়ীর ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বাঁদরে ভরিয়া গিয়াছে। লাঠি-সোটা লইয়া তখন সকলে ধাবিত হইলেন। সম্প্রদায়স্থ সকলের প্রচুর খাবার খাইয়া কপিবৃন্দের উদর তখন কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বিশেষ হাঙ্গামা না করিয়া রণে-ভঙ্গ প্রদান করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমতী বিনোদিনী দরজা খুলিয়া দিলেন এবং সমস্ত জলখাবার বানরেরা খাইয়া গিয়াছে—জ্ঞাত করিলেন।

বিনোদিনীর মাতা সম্প্রদায়ের সহিত আসিয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া মারিতে গেলেন। তাড়াতাড়ি সকলে বিনোদিনীর মাতাকে বাধা দিয়া বলিলেন,- "ছিঃ ছিঃ মেরো না, ছেলেমানুষ, ও কি জানে ? আমাদেরই অন্যায় হয়েছে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই হ'ত।" রসরাজ অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন সরস ভঙ্গিমায় বলিলেন,—"বোকা মেয়ে, আমাদের সব খাবার বিলিয়ে দিয়ে তো ব্রজবাসীদের ভোজন করালি, এখন আমরা—(বঙ্গবাসীরা) কি খাই বল্ দেখি ?"

ভুলে—বাহার !

স্বর্গীয় রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ষ্টার থিয়েটারে শার্ট ও পার্ট লিখিতেন। তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তবে মাঝে মাঝে বানান ভুল করিতেন। একদিন নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু নূতন নাটকের খাতা পড়িতে পড়িতে কয়েকটী গুরুতর বানান ভুল দেখিয়া (যথা—'যদি'—যদী) বলিলেন,—"দেখ দেখি—কিরকম ভুলেছ !"—রামবিষ্ণু খাতাখানি ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন, —"আজ্ঞে ভুল হয়েছে বটে, কিন্তু লাইনটী কেমন মানিয়েছে দেখুন। বানান ভুল না হ'লে এমন সাজন্তটী হ'ত না।"

নাম মাহাত্ম্য

ষ্টার থিয়েটারের কোন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীকে জনৈক ধনাঢ্য যুবক নিজাশ্রয়ে রাখিয়া দিয়াছিলেন। যুবকটী উক্ত অভিনেত্রী অপেক্ষা অনেক অল্পবয়স্ক।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া, সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ হে, যা শুন্‌চি, এ কি সত্য ?" অমৃতলাল মিত্র বলিলেন,—"হ্যাঁ, তাই শুন্‌ছি।" অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—"তাই তো, এ হ'ল কি হে ? আচ্ছা কি দেখে ছোঁড়াটা এমনটা ঝুঁকে পড়লো বল দেখি ?" অমৃতলাল মিত্র মহাশয় বলিলেন, "বয়স হ'লে কি হয়—বাজারে একটা নাম আছে।" বসুজ মহাশয় বলিলেন,—"বটে, তাহ'লে 'দাদা ভাই নারোজি'র তো খুব নাম, তার উপর ঝুঁকলেই তো হ'ত।"

তারাসুন্দরীর কান্না শিক্ষা।

ষ্টার থিয়েটারে যৎকালে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল' নাটক প্রথম অভিনীত হয়, সে-সময়ে অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন, দেশবিখ্যাতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতি তারাসুন্দরী যাদবের ভূমিকাভিনয় করেন। তৎকালে তিনি বালিকা মাত্র।

মদ্যপানরত যোগেশের বেচাল অবস্থা দেখিয়া যাদব মনে করিয়াছে, বাবার অসুখ করিয়াছে। এ-নিমিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে সে যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, সুরেশ তাঁহাকে দেখিয়া বলে, "কি রে যেদো, কাঁদছিস কেন ?" যাদব কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "কাকাবাবু, বাবার অসুখ ক'রেছে।" সুরেশ প্রবোধ দিয়া বলে, "অসুখ হ'য়েছিল, ভাল হ'য়ে গেছে, তার কান্না কিসের ?"

'প্রফুল্ল' নাটকের রিহারস্যাল হইতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে যাদব রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবে। কিন্তু বালিকা তারাসুন্দরীর কান্না একেবারে আসিতেছে না। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র নানারূপে তাহাকে কান্না শিখাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীর কোনরূপেই কান্না আসিল না। বার বার চেষ্টা করিয়া বালিকা শেষে বিভ্রান্তা হইয়া পড়িল। গিরিশবাবু তখন অন্য উপায় শিক্ষাদানের নিমিত্ত রিহারস্যাল স্থগিত রাখিয়া, তারাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ কি খেয়েছিস ?" তারাসুন্দরী বলিল,—"ভাত"। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুধু ভাত ? কি কি তরকারী হ'য়েছিল ?" বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কান্না শিক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া তারাসুন্দরীর মেজাজটা রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। বালিকা উত্তরে বলিল,—"শুধু ভাত।"গিরিশবাবু বলিলেন,

—"শুধু ভাত কি ক'রে খেলি, তরকারী-টরকারী কিচ্ছু হয় নাই ?" তারাসুন্দরী বলিল,—"না"। গিরিশবাবু বলিলেন,—"তোর খেলা করবার কটা পুতুল আছে ?" তারাসুন্দরী বলিল,—"নাই।" গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন. "আচ্ছা, তোর মা তোকে খুব ভালোবাসে ?" তারাসুন্দরী বলিল, –"না"।

এইরূপে গিরিশবাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তারাসুন্দরী এক কথায় তাহার উত্তর দিয়া গেলেন। গিরিশবাবু তখন কপটক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"তবেরে দুষ্টু মেয়ে !" আচার্য্যের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বালিকা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ব'লে যা, তোর পার্ট ব'লে যা। যেমন কাঁদছিস, ঐ রকম ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আসবি। ঐ রকম ক'রে কেঁদে বল. কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে। নে বল্ দেখি, শুনি।"

বুদ্ধিমতী বালিকা সেই দিন হইতেই কান্নার কৌশল শিখিয়া লইল।

হাতীর পিঠে হাতী।

বেঙ্গল থিয়েটার খুলিবার (১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক অভিনেতা উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। বিরাট ও বিশাল দেহবশতঃ সকলে তাঁহাকে "ল্যাদাড় গিরিশ" বলিয়া ডাকিত। বেঙ্গল থিয়েটারে যাঁহারা বিহারীবাবুর 'প্রভাস মিলন' অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে এখনও গিরিশ-

বাবুর ছবি অঙ্কিত আছে, তিনি যজ্ঞ-দ্বারে দ্বারী সাজিয়া পাহাড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকা অভিনয়ে ইনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'মৃণালিনী' অভিনয়ে, যে-সময় নবদ্বীপ মুসলমানকর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং নগরবাসীগণ অত্যাচারের-ভয়ে পলায়ন করিতে থাকে, সে-সময় ইনি স্থূলকায়া রমণীকে তাঁহার বিশাল পৃষ্ঠে চাপাইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুলিতে দুলিতে ছুটিতেন; বেঙ্গল থিয়েটারে যাঁহারা 'মৃণালিনী' অভিনয় দেখিয়াছেন, সম্ভবতঃ সে-অপূর্ব্ব দৃশ্য এখনও ভুলিয়া যান নাই।

উক্ত থিয়েটার একবার মফঃস্বলে কোন রাজবাড়ীতে অভিনয় করিতে যান। সম্প্রদায়ের জন্য রাজবাটী হইতে ষ্টেশনে হাতী পাঠানো হয়। গিরিশবাবু একটি বৃহৎ হস্তী-পৃষ্ঠে চড়িয়া চলিয়াছেন। পথি-মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে পুকুর হইতে জল আনিতে যাই-তেছিল। তাহারা হাতীর পৃষ্ঠে গিরিশবাবুর বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—"দ্যাখ্ দিদি দ্যাখ্—হাতীর পিঠে হাতী যাচ্ছে।" রাস্তায় একটা হাসির হর্‌রা পড়িয়া গেল। বহু লোক এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ের অনুগমন করিতে লাগিল।

রোকায় ভালোবাসা জানিবে

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে কোন প্রধানা অভিনেত্রী হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায়, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিবেচনা করিলেন, একটু পরিশ্রম করিলে কাদম্বিনী দাসী উক্ত পীড়িতা অভিনেত্রীর নূতন নাটকের ভূমি-

কাটী অভিনয় করিতে পারে, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কাদম্বিনী উক্ত দীর্ঘ ভূমিকাটী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে কি না, ইহাই সন্দেহস্থল।

স্থির হইল, মিষ্ট করিয়া তাহাকে একখানা পত্র লেখা হোক। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবুর উপর পত্র লিখিবার ভার দেওয়া হইল। অমৃতলালবাবু থিয়েটারের কোনও কর্ম্মচারীকে চিঠিখানি লিখিতে বলিলেন এবং তিনি স্বয়ং dictate করিয়া যাইতে লাগিলেন। অমৃতবাবু প্রথমেই লিখিতে বলিলেন,—"নয়নানন্দদায়িনী কাদম্বিনী।" কর্ম্মচারী সবে মাত্র উক্ত ছত্রটী লিখিয়াছেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র ব্যক্তি কোনও বিশেষ আবশ্যকে অমৃতবাবুর সহিত থিয়েটারে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

অমৃতবাবুকে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া, কর্ম্মচারীটী নিজের মনগড়া আর একছত্র লিখিয়া রাখিলেন। উক্ত ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর অমৃতবাবু বলিলেন,—"কি লিখলে?" কর্ম্মচারীটি পড়িলেন,—"নয়নানন্দদায়িনী কাদম্বিনী, রোকায় ভালোবাসা জানিবে —" তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কর্ম্মচারিটী তাঁহার মুসাবিদাটুকু সুবিধাজনক হয় নাই বুঝিয়া, অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

রঙ্গালয়ে স্ত্রী অভিনেত্রী।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাম-বাগানের দত্তবংশীয় সুবিখ্যাত ও. সি. দত্ত প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সাহসপূর্ব্বক প্রথম হইতেই গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, শ্রীমতী জগত্তারিণী এবং শ্যামা নাম্নী চারিটী স্ত্রী অভিনেত্রী লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার (১লা ভাদ্র, ১২৮৩ সাল) খুলিয়াছিলেন। বারাঙ্গনা লইয়া থিয়েটার করায়, তাঁহাদের যথেষ্ট বিদ্রূপ এমনকি গালা-গালি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

উক্ত থিয়েটারের পার্শ্বে কয়েকখানি খোলার ঘর বাঁধা হইতেছিল। জনৈক ভদ্রলোক থিয়েটারের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ঘরগুলো কি জন্য হ'চ্চে ম'শায়?" কর্ত্তৃপক্ষীয় বাবুটী বলিলেন, —"দর্শকগণের জলটল খাবার জন্য।" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"তবে যে শুন্‌লুম, আপনাদের এক্‌ট্রেসদের জন্য আঁতুরঘর বাঁধা হচ্ছে?"

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় প্রথমে এতটা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ প্রাইভেট থিয়েটারে পর্যন্ত স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় হইতেছে।

মড়া কান্না।

জোড়াসাঁকো সান্যাল-ভবনে ন্যাসান্যাল থিয়েটারের, প্রথম অভিনীত নাটক 'নীলদর্পণ।' নীলদর্পণে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় গ্রহণ করেন।

'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, রিহারস্যালকালীন নীলমাধবের মৃত্যু-শয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে মড়াকান্না কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু

তাহা সহজে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। আট দশ দিন এই-রকম কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু 'মড়াকান্না' আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রী লোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে, "ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে কাঁদে!"

অমৃতবাবু বলেন,—ব্যাপারটা এই :— "আমিতো সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্ট করিতে ক্রটী করি নাই। একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, "তোমার পার্টটা কেমন হইল দেখি?" তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন, —"না, হয় নি।" এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বানানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিৎ, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরনটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবে না, আসল ব্যাপার হচ্ছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস মহাশয়ের নিকট কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরনের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভালো লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়ো বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম, অর্দ্ধেন্দু বা কেহ আমার দোসর ছিল না। কয়েক দিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম,—'একবার আমার

কান্নার জায়গাটা শোন দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।"

পাণ্ডব-গৌরবের, সমালোচনা।

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক দেখিতে মফঃস্বল হইতে একদিন কয়েকটী দর্শক আসিয়া ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল,—উর্ব্বশীকে কখনও অশ্বিনীরূপে দেখিবে, কখনও রমণী-রূপে দেখিবে। 'দণ্ডিপর্ব্বের' গল্পে তাহারা শুনিয়াছিল, উর্ব্বশী—"রেতে কামিণী হাত দিনেতে অশ্বিনী।"

কিন্তু অভিনয়-সৌকার্য্যার্থে গিরিশচন্দ্র এইরূপ সুকৌশলে নাটক-খানি লিখিয়াছেন যে, উর্ব্বশী যতবার রঙ্গমঞ্চে বাহির হইতেছে, সব সময়েই রাত্রিকাল। সুতরাং উক্ত মফঃস্বলস্থ দর্শক কয়েকটীর একবারও উর্ব্বশীকে অশ্বিনীরূপে দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। অবশ্যই নাট্যকারের এই সময়-নির্দ্দেশের নৈপুণ্য তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ফলতঃ উর্ব্বশীকে একবারও রঙ্গমঞ্চে অশ্বিনীরূপে দেখিতে না পাইয়া, তাহারা মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

'ড্রপ' পড়িলে তাহারা থিয়েটারের বাহিরে আসিয়া তামাক খাইতে খাইতে পরস্পর এইরূপ নাটকের সমালোচনা করিতেছিল—"গিরিশ ঘোষের এই পালাটা কিচ্ছু হয় নাই। বাল্মিকী মুণি যা ল্যাখছে, তার সঙ্গে কিছুই ম্যালে না, ও আগ্‌ড়োম বাগ্‌রোম কি সব ল্যাখছে। উর্ব্বশীরে দিনরাত মনিষ্যিই দ্যাখ্‌লাম। ঘোড়ার প্যাটের মদ্দি থেকে বেরুবে, তা ঘোড়ার বালামচি অবধি ছ্যাখ্‌লাম না।"

মুখের মত।

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'পারস্য-প্রসূণ' (পারিসানা) গীতি-নাট্য অভিনয় হইতেছে। হাস্যরসাভিনয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে এবং নাট্যকলাকুশলা জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী চারুশীলা জেলে ও জেলেনীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে জেলে যখন—"তবে চল্—ঘরে চল্, পা টিপ্‌বি আর আমিরি বাত শুন্‌বি"—বলিয়া জেলেনীর সহিত প্রস্থান করে, সে-সময়ে জনৈক দর্শক বলিয়া উঠিল,—"জেলে ভাই, তোমার জেলেনীকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাও।" জেলে-বেশী অহীন্দ্রনাথ তখন অভিনয়-ছলে জেলেনী-বেশী চারুশীলাকে বলিলেন,—"শুন্‌ছিস জেলেনী, তোর ভাই কি ব'লছে?"

দর্শকমণ্ডলীর উচ্চ হাস্যধ্বনিতে রসিক দর্শকটী বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িল।

খোলস খুলিয়া আসিল।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটারের পরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও—বেঙ্গলের ন্যায় গ্রেট ন্যাসান্যালে প্রথম হইতে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী লওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রায় ছয়মাস অভিনয় করিয়া, স্ত্রী-অভিনেত্রীর সমধিক আকর্ষণ বুঝিয়া, গ্রেট ন্যাসান্যালের সম্প্রদায়গণও স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার সঙ্কল্প করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে,—কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী—এই পাঁচটি স্ত্রী অভিনেত্রী লইয়া গ্রেট

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' (কলঙ্ক-ভঞ্জন) গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়।

বেলবাবু, ক্ষেত্রমোহনবাবু প্রভৃতি যাহারা ইতিপূর্ব্বে স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকা অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিতেন, তাঁহারা অতঃপর প্রয়োজন ও সুবিধামত স্ত্রী-চরিত্রগুলি, ইহাদের সহিত সময়ে সময়ে ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার খুলিবার সময় কলিকাতায় ছিলেন না। 'সতী কি কলঙ্কিনী' খুলিবার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছিলেন।

একদিন 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয় হইতেছে, অর্দ্ধেন্দুবাবু জটিলা সাজিয়াছেন। রাধিকা-বেশী সুবিখ্যাত গায়িকা যাদুমণি, যমুনা হইতে সহস্রছিদ্রযুক্ত কলসী বারিপূর্ণ করিয়া আনিয়াছে এবং সেই বারি-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ। যশোদা নিজ ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে বসাইয়াছেন। সখিগণ গান ধরিয়াছে—"আঁখি ভরি দেখলো সই— আঁখি ভরি দেখলো।" জটিলা ও কুটীলা অধমুখে এই সময় চলিয়া যায়।

জটিলা-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু যখন চলিয়া যাইতেছেন, সখিগণ তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু ক্রোধের ভানে যেমন একটি ছোট সখীর বেণী ধরিয়া টানিয়াছেন, অমনি সখীটির ছেঁড়া খোপা হইতে লম্বা বেণীটি খুলিয়া যাইল। অর্দ্ধেন্দুবাবু মেয়েটির এমন চুলের অবস্থা জানিতেন না। তিনি আর কি করেন, বেণীটি হাতে করিয়া দর্শক-গণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"খোলস খুলিয়া আসিল!" দর্শকগণ

উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সখীটির লজ্জা ও অভিমানে দুই চক্ষু জল-ধারায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এই বালিকাটি আর কেহ নয়,—ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা গঙ্গাবাই,—যাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনী 'নসীরামে' সোনা, 'হারানিধিতে' কাদম্বিনী, 'বিজয়-বসন্তে' শান্তা ইত্যাদি মৌলিক (original)ভূমিকার অভিনয় দর্শনে, এক সময়ে নাট্যামোদীগণ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বালিকা গঙ্গামণি তখন সবেমাত্র থিয়েটারে আসিয়া যোগ দিয়াছে।

ভাদুড়ী মহাশয়।

ভাদুড়ী মহাশয় নীলামে খরিদ করিয়া পুরাতন জিনিসপত্র বিক্রয় করিতেন। বিডনগার্ডেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁহার একখানি দোকান ছিল। জিনিসপত্রাদি বিক্রয় লইয়া ষ্টার থিয়েটারের (তখন বিডন স্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার ছিল) সহিত ক্রমে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র একদিন তাহাকে একটি ভালো ছাতার জন্য বলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"ভালো ছাতার এখন আমদানি নাই, ভালো একটি মারবেল টেবিল নীলামে খরিদ করিয়াছি, ছাতার বদলে টেবিল নিলে হবেনা ?" ভাদুড়ী মহাশয়ের ব্যবসাদারী কথা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার এই উক্তিটী পরে 'আবু হোসেন' গীতিনাট্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। যথা : তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আবু হোসেন খোসবোওয়ালাকে

বলিতেছে,—"ভালো সাবান আছে?" খোসবোওয়াল্লা উত্তরে বলিল,—"আজ্ঞে, সাবানের বড় আমদানি কম, তবে নীলামে একটা বেশ মার্বেল টেবিল কিনেছিলুম, যদি বলেন তো এনে দিই। আপনার কাছে তো আমি লাভ করিনি, ক'রবোও না।"

ভাদুড়ী মহাশয়ের ঘুম !

অভিনয়-রাত্রে, ভাদুড়ী মহাশয় থিয়েটারের ভিতরে ফুট-লাইটের দিকে উইংসের একপার্শ্বে একটি চেয়ারে বসিয়া প্রায়ই থিয়েটার দেখিতেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তিবশতঃ থিয়েটার যতটা দেখিতেন, ঢুলিতেন তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনও কোনও দিন বা একেবারে ঘুমাইয়াই পড়িতেন। কিন্তু তিনি যে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে ঢুলিয়া থাকেন বা ঘুমাইয়া পড়েন, এ কথা কোন মতে স্বীকার করিতেন না।

এক রাত্রিতে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে তিনি বেশ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। জনৈক অভিনেতা আসিয়া বলিলেন,—"ভাদুড়ী মহাশয় —ভাদুড়ী ম'শায়, ঘুমুচ্ছেন যে—থিয়েটার দেখ্‌ছেন না?" অভিনেতা-টির পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকিতে ভাদুড়ী মহাশয়ের যখন গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ভাদুড়ী মহাশয়কে হঠাৎ কাঁদিতে দেখিয়া, থিয়েটারের অনেকেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ভাদুড়ী মহাশয় গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"কারো দুঃখ আমি একেবারে সহ্য ক'রতে পারিনা। সীতা বনে গেল—আহা এমন

সতী সাধ্বী—তার কপালে এত দুঃখও ছিল!—মানুষে কি এত কষ্ট বরদাস্ত করতে পারে? প্রাণটা কেমন করে উঠলো, কান্না আর চেপে রাখতে পারলাম না।”

সকলে বহু কষ্টে হাসি দমন করিয়া বলিলেন,—“সীতার দুঃখে কান্না আসে বটে,···কিন্তু ‘সীতার বনবাস’ প্লে হ’চ্ছে কই?” ভাদুড়ী মহাশয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—“তবে কি বই হচ্ছে?” একজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন,—“বিল্বমঙ্গল’ প্লে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ শুনুন, অমৃতবাবু কি acting ক’চ্ছেন?”

ভাদুড়ী মহাশয়ের কর্ণে তখন সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের জলদগম্ভীর কণ্ঠ নিঃসৃত “ভেবে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন” কথাগুলি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন তিনি আর কি করেন, দুই একবার মাথা চুলকাইয়া লইয়া বলিলেন, —“হ্যাঁ হ্যাঁ ও একই কথা, সীতাকে বনবাস্ দেওয়াও যা চিন্তামণিকে ত্যাগ করাও তাই।”

অর্দ্ধেন্দুবাবুর মাপ।

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু, থিয়েটারের জনৈক ভৃত্যকে খাবার জল আনিতে বলিয়াছেন। ভৃত্য জলের গ্লাস আনিয়া দিলে অর্দ্ধেন্দুবাবু যখন জল পান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন জলে কি একটা ভাসিতেছে। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে ভর্ৎসনা

করিতে লাগিলেন। ভৃত্যটী সংকুচিত হইয়া বলিল,—"মাপ করুন, বাবু!"

থিয়েটারে সে-সময়ে দর্জ্জি আসিয়াছিল,—অর্দ্ধেন্দুবাবু তাহার হাত হইতে 'গজকাটি' কাড়িয়া লইয়া কপট ক্রোধে বলিলেন,—"তবে আয় বেটা, তোকে মাপ করি।" ভয়ার্ত্ত ভৃত্য নজল নয়নে যুক্তকরে বলিল, —"দোহাই বাবু, ও রকম মাপ ক'রবেন না।"

ফুলুরি কি মা?

ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু প্রণীত 'তরুবালা' নাটক অভিনীত হইতেছে। স্বয়ং গ্রন্থকাব বিহারী খুড়োর ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে, পারুলের বাটিতে মাতাল বিহারী খুড়ো, পারুলের মাতাকে বলিতেছে,—"ঘরে ফুলুরিটে আসটা আছে?" পারুলের মা বলিল,--"ফুলুরি কোথা পাব।" পারুল তখন অখিল-বাবুর নিকট আদব-কায়দা বজায় রাখিবার নিমিত্ত বারাঙ্গনা-সুলভ কপটতা অবলম্বনে তাহার মাতাকেজিজ্ঞাসা করিল,—"ফুলুরি কি মা?' মা বলিল,—"ও বাছা, সে ডাল দিয়ে এক রকম ক'রে ছোট লোকেরা খায়।" বিহারী খুড়ো-বেশী অমৃতলালবাবু পারুলকে বলিলেন,—"ফুলুরি কি তা জান না? সেই যে পেয়ারা গাছে ফলে—রাঙ্গা রাঙ্গা—গায়ে কাঁটা কাঁটা, কখনো দেখনি বুঝি?"

দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য, নাট্যকারের মূলগ্রন্থে এ-কথা গুলি নাই, ইহা তাঁহার সদ্য সদ্য রচনা।

বেসুরে বাঁচিল সত্যবান!

সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামতারণ সান্ন্যাল মহাশয় চিরজীবন সঙ্গীতের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বঙ্গ রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেন। সুর বা তালের কোনরূপ অঙ্গহানি তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একরাত্রি সুবিখ্যাত গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত 'আদর্শ সতী' বা 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে। রামতারণবাবু সত্যবানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। পতি-বিয়োগে সাবিত্রী শোক সঙ্গীত গাহিতেছে।

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়াম বাজাইতেছিলেন, হঠাৎ কেমন তাহার সেদিন বেপরদায় হাত পড়িয়া গিয়া শোক-সঙ্গীতটি বেসুরো হইয়া গেল। রামতারণবাবুর কানে গিয়া তাহা তীরের মত বিঁধিল। আর কি রক্ষা আছে, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, তিনি যে সত্যবানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে মৃতাবস্থায় পতিত আছেন—সমস্ত ভুলিয়া গেলেন—তাড়াতাড়ি উঠিয়া সবেগে হারমোনিয়াম বাদকের দিকে ধাবিত হইলেন। সহসা মৃত সত্যবানকে জীবিত ছুটিতে দেখিয়া রঙ্গালয়ে একটা ভীষণ হাসির রোল উঠিল।

থিয়েটারের ভিতরে বিশিষ্ট অভিনেতারা সান্ন্যাল মহাশয়কে বলিলেন, —"রামতারণবাবু, আজ এ কি ছেলেমানুষী ক'রলেন?" রামতারণবাবু সেদিকে কর্ণপাতও করিলেন না—তিনি হারমোনিয়াম বাদকের নিকট কৈফিয়ৎ লইতে ব্যস্ত—"কেন গান বেসুরো হইল?"

রঙ্গালয়ে যে-সময় সমস্ত রাত্রি-ব্যাপি অভিনয় হইত,—সে-সময় একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' নাটকের সহিত আর একখানি নাটক জুড়িয়া অভিনয় ঘোষণা করা হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অভিনয় শেষ করিবার জন্য 'তপোবল' নাটকের কয়েকটী দৃশ্য কমাইয়া দিবার নিমিত্ত উক্ত থিয়েটারের জনৈক কর্ম্মচারীর উপর ভার দেওয়া হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটক এরূপভাবে গঠিত যে, নাটকের কোনও দৃশ্য বাদ দিতে যাইলে পরবর্ত্তী ঘটনা এবং নাটকীয় চরিত্র একেবারে অসংলগ্ন হইয়া যায়। কি উপায় অবলম্বন করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কর্ম্মচারীটী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তৎপর দিবস থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট অভিনেতা উক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কি ম'শায়, কতটা কমালেন ?"

কর্ম্মচারীটি শান্তভাবে উত্তর করিলেন,—"দৃশ্য তো একটীও কমাতে পাচ্ছি না,—কী করি বলুন দেখি ?" বিশিষ্ট অভিনেতাটী বলিলেন,—"গোটা দৃশ্য না কমাতে পারেন. প্রত্যেক দৃশ্য থেকে বেশী বেশী কথা বাদ দিয়ে যান।" কর্ম্মচারীটী বলিল,—"সেই ভাবেই যাচ্ছি।" অভিনেতাটী বলিল,—"কই, কেমন কমাচ্চেন—এক জায়গা শোনান দেখি ?" কর্ম্মচারীটী বলিল,—"এই শুনুন, প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ব্রহ্মণ্যদেব সদানন্দকে বলিতেছে, 'এই ধর না, পদীর মা ব্রত ক'রেছে, দশসের দুধ মেরে ক্ষীর করেছে, সেটুকু চুমুক দিতে হবে।' আমি দশ সের দুধ কমিয়ে পাঁচ সের করে দিয়েছি।"

কর্ম্মচারীটীর অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, সেস্থানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মার নাসিকা গর্জ্জন

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সীতা হরণ' নাটকাভিনয় হইতেছে। নাটকের সাতকড়ি চাটুজ্যে—ভূমিকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা * ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী পরস্পর প্রেমাভিনয় পূর্বক প্রস্থান করিবার পর কমণ্ডলু-হস্তে ব্রহ্মা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া মহামায়া উদ্দেশ্যে বলে :

"মহামায়া, হও মা উদয় আসি,
বর দিয়া ঠেকেছি মা দায় !

* * *

কল্পনা জননি, করুণা কর মা দাসে,
রক্ষ-কল্পনায় আশ্রয় কর' গো ত্বরা,

* * *

স্বর্ণ মৃগ-ছায়া দেহ মারীচের হৃদি-মাঝে,
ব্রহ্মার বরে মহামায়া উদিতা হইয়া

"প্রকৃতিরূপিনী আমি, জান তুমি কমণ্ডুলপানি" ইত্যাদি বলিয়া অভয় প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে ব্রহ্মার পার্ট না থাকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় থিয়েটারের ভিতরে বিশ্রামকালীন নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়েন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম

দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে কমণ্ডলু-করে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি পূর্ব্বোক্ত "মহামায়া, হও মা উদয় আসি" ইত্যাদি acting করিতেছেন, তখনও তাহার নিদ্রার জড়তা দূর হয় নাই। যাহা হউক একরকম করিয়া তাঁহার পার্ট চালাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইলে যখন মহামায়া-বেশিনী অভিনেত্রীটি "প্রকৃতিরূপিনী আমি" ইত্যাদি acting করিতেছেন, তখন হঠাৎ চক্ষু মুদিয়া আসিয়া কখন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন যে কমণ্ডলুটী তাঁহার হাত হইতে ষ্টেজের উপর পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না।

মহামায়ার কথা শেষ হইলে, ব্রহ্মাকে বলিতে হইবে—"মহামায়া, রেখ মনে—তবাশ্রিত দেবকুল।" কিন্তু কে সে কথা বলিবে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া তখন নাক ডাকাইতেছেন।

নিদ্রায় নিগ্রহ

নিদ্রাদেবীর এই অসাময়িক কৃপা-কটাক্ষে মাঝে মাঝে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকেই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়।

মনোমোহন থিয়েটারের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোনও একটি অঙ্কে পার্ট না থাকায় বিশ্রাম করিতে করিতে এমনই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, যখন তাহাকে পার্ট আসিয়াছে বলিয়া পুনঃপুনঃ ডাকিয়া জাগাইয়া দেওয়া হইল—সে কোন মতেই উঠিবে না, যখন তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইল, তখন সে—"আমি কাজে 'রিজাইন' দিলুম"

—বলিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল। বিলম্বে ষ্টেজ dull হইবার আশঙ্কায়, যখন তাহাকে তুলিয়া খাড়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল,—তখন সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষেত্রমণির ধৈর্য্য-শক্তি

প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' নাটক ১২৮৮ সাল ১৬ই শ্রাবণ প্রথম অভিনীত হয়। যদিও তৎপূর্ব্বে ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১২৮৮ সাল) তাঁহার রচিত 'আনন্দরহো' নাটক উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তথাপি 'রাবণ বধ' নাটকাভিনয়ের পর হইতেই তিনি নাট্যকার হিসাবে সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

'রাবণ বধ' শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখানো হইত। সুবিখ্যাত নাট্য-শিল্পী স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি মূর্ত্তি ও চালচিত্রাদি পিসবোর্ডে কাটিয়া অতি সুন্দর একখানি প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী পরলোকগতা ক্ষেত্রমণি দেবীকে দুর্গা সাজাইয়া দাঁড় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রমণির 'রাবণ বধ' নাটকে দুর্গার ভূমিকা ছিল।

ক্ষেত্রমণিকে হুবহু 'দুর্গা' দেখাইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিবার অভিপ্রায়, ধর্ম্মদাসবাবু কুমারটুলি হইতে আটটি মাটির হাত গড়াইয়া—তাহা চিত্রিত ও রত্নালঙ্কার-ভূষিত করিয়া ক্ষেত্রমণির পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়-

রূপে বাঁধিয়া দিলেন। দুর্গার মুখের ন্যায় রং করিবার জন্য ক্ষেত্রমণি মুখমণ্ডলে হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাখাইয়া পরে কজ্জলে নয়ন, অলক্তে অধর ও মসীতে ভ্রূদ্বয় সুচিত্রিত করিলেন!

উক্ত দুর্গোৎসব দৃশ্যটী প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অভিনীত হয়। ক্ষেত্রমণি দেবী, দশভুজা সাজিয়া তাঁহার উভয় হস্তে ঢাল-তরোয়াল এবং স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ আটটি মাটির হস্তের প্রায় অর্দ্ধমণ বোঝা চাপাইয়া, এক পদ সিংহ পৃষ্ঠে ও অন্যপদ অসুরের স্কন্ধে রাখিয়া নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন।

এই দুর্গোৎসবের দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রাম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), লক্ষ্মণ (মহেন্দ্রলাল বসু), বিভীষণ (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু), সুগ্রীব (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র), হনুমান (অঘোরনাথ পাঠক), অঙ্গদ ও গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত থাকে। প্রথমেই গন্ধর্ব্বগণ একটি গান গাহিয়া থাকে। পরে রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিয়া থাকেন,—"মিত্র, মায়ের পূজা করিতেছি, কিন্তু অভয়ার অভয়বাণী তো শুনিতে পাইতেছি না।" বিভীষণ উত্তরে বলেন,—"দেবীদহ হইতে নীলপদ্ম আনিয়া দেবীর পূজা করুন।" রামচন্দ্র বলেন—"দেবীদহ দেহের অগম্য স্থান, সেখানে কে যাইবে?" হনুমান বলিলন—"পদ-ধূলি পাইলে আমি এখনই লইয়া আসিতে পারি।" রামচন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিয়া ১০৮টি নীলপদ্ম তুলিয়া আনিতে বলিলেন। হনুমান চলিয়া যাইল।

রামচন্দ্র পুনরায় দেবীর স্তব করিলেন, তাহার পর আবার গন্ধর্ব্ব-গণেরা গান গাহিল।

দুর্গা-বেশীনী ক্ষেত্রমণির পৃষ্ঠে যে-সময়ে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অষ্ট-ভূজের গুরু ভার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে এবং বাদলার মালা, আঁচলা

ইত্যাদি ডাকের সাজে আচ্ছাদিত হইয়া ও সম্মুখস্থ ধূপ, ধুনা ও উজ্জ্বল গ্যাসালোকে তাহার অত্যন্ত গরম বোধ হইয়া ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে।

হনুমান শতাষ্ট নীলপদ্ম আনিলে রামচন্দ্র একটি একটি পদ্ম মাতৃ-পদে অর্পণ করিয়া শেষে যখন আর একটি মাত্র পদ্মের অভাব দেখিলেন, তখন হনুমানকে বলিলেন,—"আর একটি পদ্ম কোথায় ?" হনুমান বলিল,—"১০৮টি পদ্ম গনিয়া আনিয়াছি।" রামচন্দ্র বলিলেন,—"তবে দেবীদহে গিয়া আর একটী পদ্ম লইয়া আইস।" হনুমান বলিল—"প্রভু, ১০৮টি পদ্ম দেবীদহে ছিল। বোধহয় মা ছলনা করেছেন।" রামচন্দ্র বলিলেন,—"যদি মা সত্যই ছলনা ক'রে থাকেন, লোকে আমাকে 'পদ্ম-আঁখি' বলিয়া ডাকিয়া থাকে,—আমি আমার চক্ষু তুলিয়া দেবী-পদে অর্পণ করিব।" এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে ধনুর্ব্বাণ আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

এদিকে উত্তরোত্তর যন্ত্রণাবৃদ্ধি হওয়ায় ক্ষেত্রমণির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ছুটিতেছে এবং ললাটের ঘর্ম্ম, মুখের হরিতাল ও গর্জ্জন তৈলে মিশিয়া কজ্জল-ভূষিত চক্ষুর উপর অনবরত ঝরিয়া পড়ায় অসহ্য জ্বালা উপস্থিত করিল। কিন্তু তথাপি তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে পলক-হীন চক্ষে ঠিক জড় প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে পুনরায় দীর্ঘ স্তব করিয়া যে-সময়ে রামচন্দ্র দেবী-পদে অর্পণের জন্য চক্ষু বিদ্ধ করিতে যাইতেছেন,—ঠিক সেই সময়ে নিশ্চল প্রতিমা নড়িয়া উঠিল,—দুর্গা-বেশ ধারিণী ক্ষেত্রমণি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন "কি কর, কি কর দয়াময়" বলিয়া উঠিলেন, তখন দর্শকগণ বিস্ময়-রসাপ্লুত হইয়া বুঝিতে পারিলেন,—কোনও

অভিনেত্রী এতক্ষণ পলক-হীন নেত্রে দুর্গা সাজিয়া খাড়া ছিলেন। মহানন্দে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

দুর্গা-বেশধারিণী ক্ষেত্রমণি—রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দীর্ঘ অভয়-বাণী শেষ করিবার পর—যখন অপ্সরাগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া গান গাহিতেছে—তখন ক্ষেত্রমণি কাঁদিতেছেন। গীত শেষ হইলে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমণিও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

বিভীষণ-বেশী নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রঙ্গ-মঞ্চ হইতে ক্ষেত্রমণির মুখের ক্রমশঃ একটা অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ক্ষেত্রমণিকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতে দেখিয়াই, তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

তখন সকলে আসিয়া ক্ষেত্রমণির অঙ্গ হইতে ডাকের আঁচল ইত্যাদি এবং স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়-আবদ্ধ মাটির আটটি হাত খুলিয়া দিলেন। থিয়েটারের ভিতর একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিশেষরূপ শুশ্রূষার পর ক্ষেত্রমণির চৈতন্য হইল এবং মুখের হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রিত রং উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবার পর বহুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিতে সক্ষম হইলেন।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র মহা কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টিনের হাত করিয়া দিবার কথা হইয়াছিল, তাহা না করিয়া মাটির হাত কেনই বা করা হইল এবং আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রণে এই বিষাক্ত রং মাখানই বা কেন হইল?" সকলে বলিল,—"ধর্ম্মদাসবাবুর উপর প্রতিমা সাজাইবার ভার ছিল, তিনি যাহা

ভালো বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন, কাহারো সহিত এ-সম্বন্ধে তিনি কোন পরামর্শ করেন নাই।” ধর্ম্মদাসবাবুকে গিরিশবাবু ডাকিতে বলিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু অপ্রতিভ হইয়া আর গিরিশবাবুর সম্মুখে যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি থিয়েটার হইতে তখনই সরিয়া পড়িলেন।

অবশ্যই বঙ্গ-রঙ্গালয়ের আদি ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-শিল্পী ধর্ম্মদাসবাবু দুর্গা প্রতিমা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে একটা নূতন রকমের চটক লাগাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা অতটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন,—“বঙ্গ নাট্যশালা দূরে থাক—জগতের নাট্য-ইতিহাসে ক্ষেত্রমণির ন্যায় এরূপ ধৈর্য্য শক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল।”

মুস্তফী সাহেবের মুষ্টিযোগ।

মিনার্ভা থিয়েটারে যে-সময়ে অতুলবাবুর ‘শিরী ফরহাদ’ গীতিনাট্যের রিহারস্যাল হয়, সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু) মহবুবের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মহবুবকে কোনও একটি দৃশ্যে ‘হো হো’ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে হইত। কড়িবাবুর সেই হাসি প্রাণের সহিত বাহির হইত না —যেন কাষ্ঠ হাসির ন্যায় বোধ হইত। তিনি নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দু-বাবুকে ধরিয়া বসিলেন,—“সাহেব, যাহাতে আমার হাসি প্রাণের সহিত বাহির হয়, সেইরূপ আমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে।”

অর্দ্ধেন্দুবাবু ‘আজ শিখাইব, কাল শিখাইব,’ করিয়া বিলম্ব করিতে

থাকেন। কড়িবাবু প্রত্যহ অনুরোধ করিয়া শেষে হতাশ হইয়া আর তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু কড়িবাবুর বিরক্তির কারণ বুঝিয়াও বুঝিলেন না।

রঙ্গ-রঙ্গালয়ে প্রত্যেক নাটকাদির প্রথমাভিনয় রজনীতে অভিনেতৃগণ আচার্য্য ও বিশিষ্ট অভিনেতাগণকে নমস্কার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। 'শিরী-ফরহাদের' প্রথম অভিনয় রজনীতেও অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথামত সকলকে নমস্কারাদি করিলেন। কিন্তু কড়িবাবু অভিমানবশতঃ অর্দ্ধেন্দুবাবুকে নমস্কার করিলেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু কড়িবাবুর এই অভিমানের কারণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না।

যে-সময়ে কড়িবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত 'হো হো' হাসি হাসিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক সেই সময় সম্মুখস্থ উইংসের পার্শ্বে একটা শব্দ শুনিয়া যেমন চাহিয়াছে,—দেখিলেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু দিগম্বর বেশে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছেন। কড়িবাবু সেই দৃশ্য দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। অভিনয়ও সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইল।

উক্ত দৃশ্য অভিনয় করিয়া কড়িবাবু থিয়েটারের ভিতর গিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"কেমন, প্রাণের হাসি শিখ্‌লি তো, বড় যে অভিমান করেছিলি।"

কড়িবাবু বলেন,—"সে-ছবি আজ পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই এবং এমন নূতন রকমের শিক্ষাও কাহার নিকট প্রাপ্ত হই নাই।"

রোগের অবস্থা দেখিয়া কোন্ রোগীকে কিরূপ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে, গিরিশচন্দ্র এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর উভয়েই তাহা বিলক্ষণ রূপ বুঝিতেন এবং ইহাই তাঁহাদের শিক্ষাদানের বিশেষত্ব ছিল। তবে গিরিশচন্দ্র বিশেষ গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

পেটের ব্যথার মহৌষধ।

ষ্টার থিয়েটার যে-সময়ে বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল, সে-সময়ে তত্রস্থ জনৈক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মধ্যে মধ্যে 'পেটে ব্যথা ধরিয়াছে বলিয়া থিয়েটার কামাই করিতেন। অভিনয়-রজনীতে তাঁহার ভূমিকাভিনয় লইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

একদিন উক্ত থিয়েটারের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় থিয়েটারে গিয়া শুনিলেন, তাঁহাকে সে-দিন 'চৈতন্য-লীলায়' জগাই-এর ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। 'প' বাবুর আজও আবার পেটে ব্যথা ধরিয়াছে, আসিতে পারিবেন না বলিয়া' খবর পাঠাইয়াছেন।

অভিনয় আরম্ভ হইবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। অমৃতবাবু কতকটা বিরক্ত হইয়া এবং প্রকৃত ব্যাপারটাই বা কি তাহা জানিবার জন্য থিয়েটার সন্নিকটস্থ 'প' বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

'প' বাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। অমৃত-বাবুকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিয়াই হুঁকা রাখিয়া যন্ত্রণাসূচক চীৎকার আরম্ভ করিলেন। অমৃতবাবু মুহূর্ত্তে স্বরূপ অবস্থা বুঝিয়া লইলেন এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইয়া তৎক্ষণাৎ পেটে বেলেস্তারা

লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 'প' বাবু এস্ত হইয়া বলিলেন,—"একে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি, তাহার উপর বেলেস্তারার জ্বালা সহ্য করিতে পারিব না। বেলেস্তারা লাগাইয়া আর কাজ নাই।" অমৃত-বাবু বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, বেলেস্তারা দিলে এখনই যন্ত্রণার উপশম হইবে।" এই বলিয়া তিনি 'প' বাবুর অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেলেস্তারা আনাইয়া পেটে লাগাইয়া দিলেন এবং যে-পর্য্যন্ত না তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল, সে পর্য্যন্ত সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন না।

ইহার পর 'প' বাবু মাঝে মাঝে থিয়েটার কামাই করিতেন বটে, পেটের ব্যথার নাম আর কখনও মুখে আনেন নাই।

আনাড়ী ভৃত্য।

কোহিনুর থিয়েটারে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটকের অভিনয় হইতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা স্বর্গীয় মুনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু) একলাস খাঁর ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চ হইতে ভিতরে আসিয়া তিনি মহাবীর নামক জনৈক নূতন বেয়ারাকে তামাক দিতে বলিলেন। সে হুঁকা না ফিরাইয়া তামাক দেওয়ায় মণ্টুবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং হুঁকা ফিরাইয়া পুনরায় তামাক সাজিতে বলিলেন। ভৃত্য প্রস্থান করিলে, তাঁহার পার্ট আসায় তিনি তাড়াতাড়ি ষ্টেজের উপর প্রবেশ করিলেন।

নূতন ভৃত্যটী ভয়ে ভয়ে ভালো করিয়া হুঁকায় ছিঁচ্‌কে দিয়া ও

ল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল—বাবু ষ্টেজের উপর অভিনয় করিতেছে। সে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ষ্টেজের মধ্যে গিয়া মণ্টুবাবুকে তামাক দিতে গেল। মণ্টুবাবু যতই পশ্চাদ্‌পদ হইয়া তাহাকে সঙ্কেত করিয়া চলিয়া যাইতে বলেন—সে ততই কলিকায় ফুঁ দিয়া হুঁকা হস্তে অগ্রসর হইতে থাকে। সহসা এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মণ্টুবাবুর ক্রোধ-রক্ত-নয়ন এবং দর্শকগণের হৈ-হৈ শব্দে নূতন ভৃত্যটি হতভম্ব হইয়া পড়িল। হঠাৎ উইংসের দিকে চাহিয়া দেখে—সকলে তাহাকে তীব্রস্বরে ডাকিতেছে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে হুঁকা লইয়া প্রস্থান করিল।

দইয়ে ভূত।

অনেক সময় নাট্যকারেরা, বাস্তব ঘটনা সুকৌশলে তাহাদের নাটকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। একটি হাস্যরসাত্মক সত্য ঘটনা মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকে কিরূপ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্ব-বিখ্যাত রামমোহন রায়ের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ দানশীল ও উদারচরিত স্বর্গীয় হরিমোহন রায় মহাশয় কিরূপ সৌখিন এবং খামখেয়ালী মেজাজের লোক ছিলেন, তাহা বোধহয় অনেকেই জানেন। বাটীর সম্মুখে তাঁহার বাজার বসান, তাঁহার সখের যাত্রা, হোরমিলার কোম্পানীর সহিত টক্কর দিয়া অল্প ভাড়ায়—ক্রমে বিনা ভাড়ায় ও একঠোঙ্গা করিয়া প্রত্যেক আরোহীকে খাবার উপহার দিয়া

—গীত-বাদ্য-মুখরিত নিজ জাহাজে আরোহীগণকে গ্রহণ করা ইত্যাদি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখনও গল্পের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে।

এক সময়ে রাত্রিকালে তাঁহার দধি বিক্রয় করিবার ঝোঁক হওয়ায়, তিনি তাঁহার 'মধুসূদন' নামক একজন ভৃত্যকে রাত্রি ৯ টার পর সহরে দধি ফিরি করিতে পাঠাইতেন। মধুসূদন গভীর রাত্রি পর্যন্ত "চাই দই, চাই দই" করিয়া সহরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সহরবাসীগণ শয়ন করিয়া তন্দ্রাবস্থায় মধুসূদনের কণ্ঠস্বর শুনিতেন—আবশ্যকবোধে কেহ কেহ ক্রয়ও করিতেন। রসিক সম্প্রদায় মধুসূদনকে লইয়া মজা ও আমোদ করিতেন।

কিছুকাল পরে আর রাত্রিকালে মধুসূদনের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত "চাই দই—চাই দই" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। সহরে রাষ্ট্র হইল—মধুসূদনের অকালমৃত্যুতে হরিমোহনবাবু দধি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কিছুদিন গত হইলে আবার গভীর রাত্রিতে মধুসূদনের গলার ন্যায় সেই "চাই দই, চাই দই" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সহরে একটা গুজব উঠিল—মধুসূদন মরিয়া "দইয়ের ভূত" হইয়াছে এবং সেই দইয়ের ভূতই রাত্রে "চাই দই, চাই দই" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

কোনও একটি বারাঙ্গনা কোনও একটি বাবুর আশ্রয়ে ছিল। বারাঙ্গনাটির দৃঢ় বিশ্বাস—মধু 'দইয়ের ভূত' হইয়াছে, বাবু কিন্তু কোনও মতে ভূত মানিতে চাহেন না; তিনি উপহাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন। একদিন রাত্রে এই লইয়া তর্ক করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ রকম বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। শেষে বারাঙ্গনা ভীষণ কুপিতা হইয়া বাবুটিকে বলিল,—"যদি 'দইয়ের ভূত' মানো, আমার ঘরে থাক,

—নইলে এখনি বেরিয়ে যাও।"

বাবুরও খেঁচসা করিয়া মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি রাগ করিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত। থিয়েটার সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। হঠাৎ অসময়ে থিয়েটারে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, যখন তিনি 'দইয়ের-ভূত' না মানিবার জন্য তাড়িত হইয়া আসিয়াছেন বলিলেন—তখন সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নাট্যাচার্য্য উক্ত ঘটনাটি 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা: ঘেসেড়ানী ঘেঁসেড়েকে বলিতেছে,—"তুই 'ঘোড়া-ভূত' মান্‌বি নি?" ঘেসেড়ে বলিল—"না"।

ঘেসেড়ানী বলিল,—"তবে বেরো—তুই। তোর মত পাঁচ পোন ঘেসেড়া আমি এখনি বাজার থেকে নিয়ে আসবো। আমার সাফ কথা,—ঘোড়া-ভূত মান্‌তে চাও, আমার সঙ্গে থাক, ভাত বেড়ে দিচ্ছি খাও, আর যদি না মান্‌তে চাও—বেরোও।"

"নিশি গর্জ্জন্তি।"

'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের একখানি গীতের প্রথম ছত্র পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়। ঘটনাটি এই ঃ

একদিন রাত্রি প্রায় ২টার সময় অনিদ্রাবশতঃ গিরিশচন্দ্র ভাগীরথী নামক তাঁহার একজন উড়ে খানসামাকে গা-হাত টিপিয়া দিতে ডাকিয়াছেন। ভাগীরথী আসিয়া গা-হাত টিপিয়া দিতেছে।

এমন সময়ে তিনি বলিলেন,—"হ্যাঁরে, কি একটা শব্দ হ'চ্ছে নয়!—কি শব্দ বল দেখি?" উড়ে ভৃত্যটি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"নিশি গর্জ্জন্তি।"

ভাগীরথীর এই উত্তরে কবি-হৃদয়ে বেশ একটু রসের উপলব্ধি হইল। সে-সময় তিনি 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক লিখিতেছেন। ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর গান বাঁধিবার সময়—এই রসের তিনি অবতারণা করেন। যথা :

"কালা রাতি চলে সাঁই সাঁই সাঁই!"

গলায় ডরি ডেব, নইলে হট্টুকী খেয়ে মরবো।

নাট্যাচার্য্য ও রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'সরলা'র অভিনয়ে একস্থলে গদাধরচন্দ্র বলিয়া থাকে, "হয় আমি গলায় ডরি দেব, নইলে হট্টুকী খেয়ে মরবো।" অমৃতললাবাবু তাঁহার বাল্য-স্মৃতি হইতে এই রসাল বুলিটা গদাধরচন্দ্রের মুখে বসাইয়া দিয়াছিলেন। মূল ঘটনাটী এই :

বাল্যকালে যখন শ্যামবাজার বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, সে-সময়ে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের পার্শ্বে খোলার ঘরে এক ঘর ময়রা বাস করিত। বৃদ্ধ ময়রার সহিত প্রায়ই তাহার স্ত্রীরঝগড়া হইত। একদিন ময়রা-বুড়ো ঝগড়া করিতে করিতে অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেছে,—"আর আমি এ প্রাণ রাখবো না। হয় গলায় দড়ি দেব, নইলে হত্তুকী খেয়ে মরবো!"

টিফিনের ছুটিতে অমৃতলাল ও অন্যান্য ছাত্রগণ ময়রা বুড়োর এই

কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু কবি হৃদয়ে সেই রস-স্মৃতি লোপ পায় নাই, যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মীরকাসিমের দাড়ি।

গিরিশচন্দ্র যখন যে নাটক লিখিতেন, তখন সেই নাটকীয় ভাব ও চরিত্র লইয়া দিবারাত্র আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। ঐতিহাসিক 'মীরকাসিম' নাটক লেখা হইতেছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন পরম পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"কি হে মঠ থেকে কবে এলে ?" স্বামীজী বলিলেন,—"তিন দিন এসেছি।" গিরিশবাবু বলিলেন,—"তিন দিন কলকাতায় এসেছ, আর আজ এখানে এলে ? যে কদিন এখানে থাক্‌বে, প্রত্যহ একবার ক'রেও আস্‌বে। তোমাদের দেখলে থাকি ভাল। অনেকদিন ধরে ঠাকুরের কথা হয় নাই। একটু recreation-এর আবশ্যক হয়েছে। 'মীরকাসিম', নাটক লিখছি। কেবল ষড়যন্ত্র—কেবল ষড়যন্ত্র—প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। কাল ইচ্ছা ক'রেই বই লেখা বন্ধ রেখেছিলুম ; তবুও সমস্ত রাত ভালো ঘুম হয় নাই। ঘুমুলেই স্বপ্নে দেখি, মীরকাসিম মুখের কাছে এসে এক গাল দাড়ি নাড়্‌ছে।"

*১৯১১ খৃঃ মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট, উত্তেজক গ্রন্থ বলিয়া গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা,' 'মীরকাসিম' এবং 'ছত্রপতি' 'শিবাজী' ঐতিহাসিক নাটক তিন খানি অভিনয়, বিক্রয় এবং পুণর্মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন।